আমার শিকার স্মৃতি

৺বিজয়কান্ত সেন কথিত

ও

শ্রীমতি জ্যোতি সেন কর্তৃক অনুলিখিত

মেরিট পাবলিশার্স
৫১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

প্রকাশক—
শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মেরিট পাবলিশার্স
৫১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মুদ্রক—
শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য
শ্রীভূমি প্রেস
৭৭ ধর্ম্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা—১৩

পূর্বাভাষ

১৮৯৮ সালের এক শরৎ প্রভাতে আমার পূজনীয় খুল্লতাত ৺কান্তিভূষণ সেন আমাকে বন্দুক ব্যবহারে শিক্ষা দেন। তখন আমার বয়স ১৩ বৎসর। স্কুলে পড়ি। পরে সুযোগ ও সৌভাগ্যের যোগাযোগে বহু গুরুর নিকটে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা এবং শিকারবিদ্যা লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুরু ছিলেন মানভূম জিলার ঝালদার রাজা, বন্ধুবর ৺রায়বাহাদুর উদ্ধবচন্দ্র সিংহ। অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ, শিকারের নিশ্চল ও একাগ্র আসন, আত্মবিশ্বাস (Strong Nerve) ও নির্ভীকতায় ইঁহার সমকক্ষ আমার দীর্ঘজীবনে অন্য কোনও শিকারী দেখি নাই। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে, ১৯১০ সালে, রাঁচী জিলার কোলেবিরা থানার ভগর পাহাড়ের জমিদার শ্রদ্ধেয় রণবাহাদুর সিংয়ের নিকট সাহস, অধ্যবসায় এবং সহযোগী শিকারী অরণ্যবাসীদের সঙ্গে সমপ্রাণতা, নিজে বিপদের সম্মুখীন হইয়া সহযোগীদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা—শিক্ষা পাই। ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছার বিখ্যাত শিকারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও তাঁহার সমবিখ্যাত শিকারী বন্ধু গোবরডাঙার জ্ঞানদা বাবুর নিকট ১৯১১ সালে হাজারীবাগে তাঁহাদের প্রবাস যাপন কালে বিভিন্ন রকমের শিকার কৌশল ও তদুপযুক্ত রকমারী বন্দুক এবং তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করি। গিরিডির কোয়াড় গ্রামে বড়কু মাঝির নিকট অরণ্যচারী জীব-জন্তুর পদচিহ্ন পরিচয়, তদনুসরণের রীতিনীতি, সম্বন্ধে শিকার বিজ্ঞানের এক নূতন রাজ্যে প্রবেশের প্রথম দীক্ষা লাভ করি। গয়া জেলার নবীনগর থানার বাসডিহার জমিদার শ্রীযুত কালীপ্রসাদ সিংহ হাঁকোয়া করিয়া বাঘ শিকার করার এবং মড়ির উপর বসিয়া বাঘ মারার রীতিনীতি শিক্ষা দেন। বনে জঙ্গলে শিকারের আবশ্যকীয় বহু তথ্য, "কি ও কেন" তাঁর কাছেই প্রথম শিক্ষা লাভ করি। ঔরঙ্গাবাদ থানার পয়োই (Pawai) গ্রামের বৃদ্ধ শিকারী এবং জমিদার সাজীবন লাল ঘোড়ায় চড়িয়া বর্শা দিয়া শিকারে অভ্যস্ত করান। পালামৌ জেলার নেতারহাটের অধিবাসী ধাওতাল উরাঁও এবং অগুরু বিরিজিয়া বনে জঙ্গলে শিকার উদ্দেশ্যে চলাফেরা করার কায়দা-কানুন, শিকারের ভূমি, আবাস এবং চিহ্ন, ভাষা ও শব্দ (interpretation

of animal sign and sound) শিক্ষা দেন। "ঘাহিল বাঘ"কে রক্তচিহ্ন দেখিয়া কোন্ অঙ্গে গুলি লাগিয়াছে, কতদূর আহত, mortal wound কি না এবং তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া অনুসরণ করিয়া গুলি করিয়া মারার একমাত্র শিক্ষাগুরু এই ধাওতাল ছিল। বিপদের সম্ভাবনায় কেবল এক টাঙী হাতে লইয়া আমার সহচর ও রক্ষক, এই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সাহসী আদিবাসী প্রকৃত বন্ধু, ধাওতাল উরাঁও অন্ততঃ ১৫।১৬টি ঘটনায় সঙ্গ দিয়াছে। ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আহত বাঘের তাড়া সহ্য করিয়া স্থির বিশ্বাস রাখিয়া—যখন অপর সকল শিকারীগণ দৌড়াইয়া পলাইয়াছে অথবা গাছে আরোহণ করিয়াছে,—বাঘ মারিবার পর দেখিয়াছি ধাওতাল এক পা-ও আমার পাশ ছাড়িয়া যায় নাই। এই প্রকারে বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত অথচ প্রকৃত শিকারী, অরণ্যবাসী, আদিবাসী, ব্যাধ, লুব্ধক (trapper), অনেক স্তরের গুরু লাভ হইয়াছে। আজ জীবন সন্ধ্যায় তাঁহাদের কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লেখ না করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না।

(১) চোয়া ভুঁইয়া, হাজারীবাগ। চাহা কাবে কায়দা।

(২) টুনু ভোগতা, বাবাদরী থানা, রাংকা পালামৌ—হরিণ, শাম্বর, tracking এবং কালাভিতির শিকার।

(৩) শিউধারী ভুঁইয়া, কেড়, পালামৌ।—বাঘ ভল্লুক বাইসন (tracking ও তাহাদের স্বাভাবিক ভাগান, মানে পালাবার রাস্তা নির্দেশ।

(৪) গোবর মাঝি (খরোয়ার) গারু, পালামৌ। বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, বাইসন, ময়ুর মুরগী এবং তাহাদের স্বাভাবিক চলাফেরার পথ।

(৫) চৈত ভোগতা, লাত ও সেবেন্দাগ পালামৌ। ঐ

(৬) ইয়াকুব খাঁ, জমিদার, হেদ্‌লাগ হাজারীবাগ। বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, ময়ূর, মুরগী শিকার।

(৭) মনবহাল খেরোয়ার—বাঘ ইত্যাদির tracking ও শিকার।

(৮) সুকরা উরাও, কুরুমগড়, রাঁচী—বাঘ ইত্যাদির শিকার।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সরকারী চাকরী জীবনের মধ্যে প্রায় ২৭ বৎসর ছোটনাগপুরের পাহাড় জঙ্গলে Survey Settlement, Special Land Acquisition for Railways and Collieries ete. Khasmahal, Wards and Encumber Estates, Forest Settlement and Reservation এবং General Department-এর কাজে অতিবাহিত করিয়াছি। এ অঞ্চলের রাঁচী, হাজারীবাগ, গিরিডি, মানভুম, ধানবাদ, পালামৌ এবং তৎসংলগ্ন গয়া জেলার এমন কম জঙ্গল পাহাড় ও গ্রাম অঞ্চল

আছে যেখানে যাতায়াত এবং শিকার করার সুযোগ গ্রহণ করি নাই। এই সব জঙ্গলের অধিবাসীরা অল্পবিস্তর সবাই jungle craft এবং অরণ্যচারী জীবজন্তুর চাল-চলন, "রাহান-সাহান" (রাহান=বিশ্রাম বা রাত্রিবাসের স্থান, সাহান=ক্রীড়াভূমি এবং চরাগাহ, চরবার জায়গা) সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। যে এলাকায় যাহারা বাস করে তাহারা সেই এলাকার জন্তু-জানোয়ারের চাল-চলন বিষয়ে অভিজ্ঞ। ভিন্ন ভিন্ন এলাকার অরণ্যচারী জীব-জন্তুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভেদে জীবনযাত্রার খাদ্য এবং তৎসংগ্রহের উপায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রত্যেক এলাকার বিশিষ্ট অভিজ্ঞ শিকারীদের তীর্থগুরু করিয়া অনেকের শিষ্যত্ব ও অনুগ্রহ গ্রহণ করিয়াছি। শিকারের "কি ও কেন" আমার শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক মনের দ্বারা বিশ্লেষণ এবং আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি; বিশেষ করিয়া বাঘ ভল্লুক এবং বাইসন জাতীয় জীব-জন্তুর।

আমার বরাবর বিশ্বাস যে বইয়ে লিখিয়া শিকার শিক্ষা দেওয়া যায় না। বনে জঙ্গলে কার্য্যত এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ভিন্ন জনসাধারণ, বিশেষতঃ শহর বা পল্লীবাসীর পক্ষে এ বিদ্যা প্রকৃত শিক্ষা করা সম্ভবপর নয়। এ অবস্থায় লিপিবদ্ধ হিসাবে একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞাপন দেওয়া ও অলস অবসরের মনোরম সময় কাটানোর সুবিধা ভিন্ন অন্য কোন সার্থকতা নাই। এই কারণে খ্যাতনামা অনেক শিকারী উপরওয়ালা, রাজ্যপাল† I.C.S, I P. S., I. E. S., I F. S. বন্ধু ও সহকর্ম্মীর বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আমার শিকার শিক্ষা, বিশেষতঃ art of tracking and reading game sign and pug-mark সম্বন্ধে কখনও কোন লেখা প্রকাশ করি নাই।

"গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা না মিলে এক" এই প্রচলিত প্রবাদের সত্যতা অতি দুঃখের সহিত উপলব্ধি করিয়াছি। দীর্ঘ জীবনে শিকারের আর্টের সেবা করিয়া যাহা কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলাম এবং তাহাকে যে অভ্রান্ত scientific finish-এ দাঁড় করাইয়াছিলাম সে বিদ্যা দান করিবার উপযুক্ত পাত্র পাই নাই। দুঃখ হয়, এ সঞ্চয় আমারই সহিত শেষ হইবে। পরিশ্রম ও অবসর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সুতীক্ষ্ণ কান ও ঘ্রাণ শক্তির প্রয়োগ, জীবজন্তুর স্বাভাবিক অভ্যাসগত চিন্তার ধারা, কার্য্য ও চলাফেরার কায়দা (quick

† Sir Henry Wheeler I.C S. Sir Hugh Stephenson I. C. S., Sir James Sifton I.C.S. বিহারের রাজ্যপাল, Sir Laurie Hammond আসামের রাজ্যপাল।

interpretation of animal instincts and signs) এ সব শিকারীর থাকা দরকার। তারপর নিশানা, আত্মবিশ্বাস (strong nerve) নির্ভীকতা, sporting spirit ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকার বিশেষ দরকার। আমার বিশ্বাস অনেক শিকারীরই এসব অল্পবিস্তর অথবা চলনসই রকম আছে। কিন্তু যে দীর্ঘ জীবন ছোটনাগপুরের বনে জঙ্গলে আমি এসব অর্জ্জন ও উপভোগ করিয়াছি একমাত্র স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু ভিন্ন অন্য কোন শিক্ষার্থীর ভিতর এসব গুণ পাই নাই অথবা এসমস্ত গুণসম্পন্ন অন্য কাহারও সঙ্গে আমার যোগাযোগের সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। অহিংসা গুরু গান্ধীজীর শিষ্য ও সেক্রেটারী নির্ম্মলকুমার অনেক সময় আমার সঙ্গে প্রকৃতির লীলাভূমি জঙ্গল, পাহাড়, উপত্যকা এবং তাহাদের অধিবাসী বিভিন্ন আদিম জাতির বহু লোকের সঙ্গসুখ উপভোগ করেছেন। ইংরাজ রাজত্বে যখন তিনি সি-আই-ডির নজরবন্দী তখনও তাহাকে রাজ্যপাল Sir Henry Wheeler, **Sir Hugh Stephenson** প্রভৃতির শিকার ক্যাম্প ও রাজভবনে নিয়ে গিয়েছি। রাজ্যপালদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয়, আলাপ, আলোচনা এবং মাচায় বসে একসঙ্গে শিকার উপভোগ করেছেন। অহিংসা গুরুর চেলাকে বন্দুক ধরাইয়া হিংস্র পথের শিষ্য করিতে পারি নাই বটে কিন্তু স্বচ্ছন্দমতি অরণ্যবাসী ও তাহাদের প্রতিবেশী জীব-জন্তুর নির্ভয়ে নিজ আবাসে চলাফেরার সুযোগ উপভোগ একসঙ্গে করেছেন। নির্ম্মলকুমারের আগ্রহ, উৎসাহ ও চেষ্টায় আমার কন্যা শ্রীমতী জ্যোতি সেন আমার গত জীবনের কয়েকটি ঘটনা গল্পচ্ছলে বর্ণনা হইতে এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পীস হ্যাভেন
হাজারীবাগ
২৯. ৮. ৫৬.

বিজয়কান্ত সেন

শ্রীনির্মলকুমার বসু

স্নেহাস্পদেষু—

সূচীপত্র

১।	অতীতের এক পৃষ্ঠা	১
২।	একোয়া	৭
৩।	শিকারী বন্ধু কালীপ্রসাদ সিংহ	১৪
৪।	মরণের ভয়	২০
৫।	বাঘ কাব	২৬
৬।	বন্ধু ইয়াকুব খাঁন	৩৪
৭।	স্যার এডোয়ার্ড গেট	৪২
৮।	বীর কেশরী সিং	৪৮
৯।	প্রসাদ	৫৬
১০।	গোকুল সিংহ	৬৩
১১।	আদম খোর বাঘ	৭১
১২।	রণ বাহাদুর সিং	৭৯
১৩।	রাজ বাহাদুর উদ্ধব সিংহ	৮৪
১৪।	বার বার তিন বার	৮৯
১৫।	পত্থল দেওতা	৯৮
১৬।	বাইসন	১০৫
১৭।	চিতা—১	১১৭
১৮।	চিতা—২	১২৩
১৯।	চিতা—৩	১২৯
২০।	মা	১৩৪
২১।	সাথী	১৩৯

এক

অতীতের এক পৃষ্ঠা

"মিললেই 'হো ?"

"হাঁ হো, মার দেলকেই"

"কাঁ'হা পর ?"

"উ-উ-উ হাঁ, জঙ্গল কিনারে কুর্থী ক্ষেতমে।"

১৯১২ সাল। চাকরির প্রারম্ভে তখন আমি গয়া সেট্‌লমেণ্টে শিক্ষানবীশ। সকালবেলা আমিনের প্লেন টেব্‌লের উপর তার কাজ পরতাল করে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি। পালামৌ ও গয়ার সীমান্ত। দক্ষিণ দিগন্তে দেখা যায় পালামৌর ঘন বনে ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ এসে থেমে গেছে, তার কোল থেকে বিছিয়ে আছে গয়া জেলার সমতল ভূমি—বন্য ফুলের লতানে ঝোপে-ঝাড়ে ভরা। এ জায়গাটা প্রকৃতি ও মানব সভ্যতার যুদ্ধক্ষেত্র বলা যেতে পারে। দশ-পনেরো ঘর দরিদ্র চাষীর বসতি। তারা কঙ্করময় অনুর্বরা প্রকৃতিকে শস্যশালিনী করবার চেষ্টায় বন জঙ্গল কেটে চাষ করে, তিল, কুর্থী সুরগুজা, অড়হরের যে সব শস্য অতি দরিদ্র ভূমিতে জন্মায় এবং এক বছর চাষের পর দু-তিন বছর জমি ফেলে রেখে দেয়, রিক্ত প্রকৃতিমাতা যাতে নতুন জন্মদানের জন্য প্রাণশক্তি সঞ্চার করে উঠতে পারেন। এই সুযোগে কেটে ফেলা বন্য গাছের গোড়া থেকে নতুন ডাল-পালা গজিয়ে উঠে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় আত্মরক্ষার জন্য অতীতে এই জেলায় অনেকগুলি মাটির কেল্লা গড়ে উঠেছিল। এই পাহাড় ঘেরা অঞ্চলের গ্রাম্য জমিদাররা উঁচু জায়গা দেখে মাঝখানে তৈরি

করেন তাঁদের সুউচ্চ মাটির গড়, খোলার চাল দেওয়া, তার আসে-পাশে তাঁদের আশ্রিতদের ঘর বাড়ি এবং পুরু মাটির প্রাচীর দিয়ে এ সমস্ত ঘিরে দেওয়া হয়। প্রাচীরের কিছু দূরে খুব ঘন করে লাগানো হয় তাল গাছের সারি, যাতে তীর বা গোলাগুলি এই তাল শ্রেণীর ব্যূহ সহজে ভেদ করতে না পারে, অথচ তার আড়ালে আত্মরক্ষা করে এরা অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে শত্রুর উপর। কালের প্রকোপে এইসব কেল্লার অনেকগুলিই ধ্বংসপ্রায়, কোথাও কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই, রূপ নিয়েছে মাটির স্তূপে, কোথাও বা শুধু মাত্র উঁচু জমি যেখানে চাষ-আবাদ চলছে। কেবল তালের ঘন শ্রেণী আজও দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন যোদ্ধার মত অতীতের সাক্ষ্য ও স্মৃতি নিয়ে। এমনি একটি ধ্বংসস্তূপের পেছনে আমার প্লেন্ টেব্ল।

দাঁড়িয়ে কাজ করছি, গ্রামের অধিবাসীরা অনেকে জড় হয়েছে চারপাশে। হাকিম কে, সে কি কাজ করছে তাও দেখতে এবং নিজেদের সুখ দুঃখ জানাতে। এমন সময় একজন নবাগত আগন্তুকের সঙ্গে গ্রামবাসী একজনের কথোপকথন কানে এলো। তখনই বুঝলাম বাঘে কিছু মেরেছে যার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, কারণ এখানে মাঝে মাঝে পাহাড় বন থেকে এসে গ্রামের সীমায় যে সব গরু মোষ চরে তাদের উপর ওরা অতর্কিত আক্রমণ করে। শিকারের নতুন নেশা তখন, নতুন উদ্যম। তাড়াতাড়ি কলম নামিয়ে আগন্তুককে প্রশ্ন করে জানলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তারই নতুন কেনা গরুকে মেরে অদূরে কুর্থি ক্ষেতে ফেলে রেখে গেছে। তখনই বেরিয়ে পড়লাম—সঙ্গে চল্‌ল গ্রামবাসীর দল। বনের কিনারায় ছাড়া ছাড়া ক্ষীণ কুর্থি গাছের মধ্যে পড়ে রয়েছে গরুটি। এক ঝটকায় তার প্রাণ বের করে দিয়েছে। গরুর

কাঁধে শিঙের নীচেই তুপাশে বড় তুটি তুটি চারটি দাঁতের চিহ্ন পরিষ্কার বিদ্যমান, শুধু রক্তটুকু চেটে খেয়ে গেছে। মনে হল ভোরেই মারা। দিনের আলোতে খোলা জায়গায় আত্মগোপন শ্রেয় মনে করে বাঘ সরে গেছে। নবজাত ঝোপ-ঝাড় বাঘের আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থান নয়। বিস্তীর্ণ ক্ষেতের মাঝে কাছাকাছি কোথাও বড় গাছ নেই যার উপর বসে অপেক্ষা করা চলে। দেখলাম কাছে মরা গরুটির পূর্বে এক বন্য কুলের ঝোপ। ঠিক করলাম মাটিতে বসেই বাঘ মারবো এবং ঝোপটি আশ্রয় করলে পূর্বদিক দিয়ে যখন চাঁদ উঠবে তখন সামনে মড়ির উপর সোজা আলো পড়বে। সঙ্গের গ্রামবাসীদের বললাম ঝোপের বাইরের সব ডালপালা অক্ষত রেখে মাঝখানটায় চার হাত লম্বা তুহাত চওড়া কোমর সমান একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলতে, কিন্তু খুব সাবধান, কোথাও যেন কোন চিহ্নমাত্র না থাকে। কাটা ডালপালা বা খুঁড়ে তোলা মাটি দূরে নিয়ে ফেলে আসে যেন। বাঘের দৃষ্টি অতি সতর্ক, কোথাও যদি সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে তারা তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ত্যাগ করে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাদের কাজ শেষ হল। গ্রামবাসীদের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে একজন গোয়ালাকে সঙ্গী করতে হল, সেও নাকি বাঘ মেরেছে। শিকার করতে গেলে যোগাভ্যাসের মত অভ্যাস করতে হয় নিঃশব্দ অনড় হয়ে। জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত যাতে না হয়, হাঁচি-কাশি তো দূরের কথা। মশার কামড়েও কোন রকম না নড়া, কোনও অঙ্গ চালনা করিতে হলে তা অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে। গতিহীন জড় বনের মৃত্নতম সঞ্চালনও সূচিত করে প্রাণীর অস্তিত্ব, সামান্য ফড়িংয়ের লাফও তাকে দৃষ্টি-গোচর করে তোলে বন্য প্রাণীর দৃষ্টির সামনে। যাই হোক, মোড়া পেতে বসলাম তুজনে, পাশে তৈরি Jeffry's ·333 bore cordite

rifle। গর্তটির উপর কয়েকটি কাঠ দিয়ে তার উপর ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, যাতে সেখানে যে গর্ত আছে তা বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর না হয়। আমরা এমনভাবে বসেছি যে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে বসলে ঝোপের গোড়ার ফাঁক দিয়ে আমাদের সামনে হাত সাত-আঠ দূরে দেখতে পাই মৃত গরুটি পড়ে আছে, আবার মাথা নীচু করলেই অদৃশ্য হয়ে যাই।

ক্রমে সূর্য অস্ত গেল। সূর্যাস্তের ক্ষীণ আভাটুকুও বিলীন হয়ে এল। থেমে গেল নীড়াগত পাখীদের কাকলি। শুক্লা-ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে রচনা করলো আলো-আঁধারির মায়া। মাঝে মাঝে শোনা যায় নিশাচর পাখার ডাক, ডানার ঝট্‌পট্‌, কখনও বা চাবদিক কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে হুতোম প্যাঁচা "দূরগুম্"। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পাহাড়ের মাথায় মাথায় জেগে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। আমরা বসে আছি অধীর প্রতীক্ষায়, আসবে এই আশায মন সজাগ।

রাত তখন এগারটা। মাথা উঁচু কবেই দেখি প্রকাণ্ড বাঘ। সামনের দুটো পা মড়িটার উপব দিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের ঝোপের দিকে চেয়ে আছে, ভাবটা যেন সত্যি ঝোপই তো, যেমন ছিল? আমিও চুপ করে চেয়ে বইলাম। তার মস্ত মাথা, চওড়া ছাতি এবং কালো মোটা ডোরা আজও স্পষ্ট ভেসে ওঠে স্মৃতির নয়নে। কিছু পরে নিঃসন্দেহ হয়ে যেই সে খাবারের জন্য মুখ নিচু করেছে, অমনি আমিও বন্দুক ধবেছি। তাই দেখে উৎসুক গোয়ালাও মাথা তুলল এবং অতর্কিতে তার ভয়ার্ত কণ্ঠে বেরিয়ে এল, "আরে বাপ রে, কাড়া সে ভি বড়া হ্যায়।" সঙ্গে সঙ্গে একটি উল্টন দিয়ে বাঘ অদৃশ্য, তার পলায়নের চিহ্নও রহিল না এত ক্ষিপ্র তার গতি। শিকারী স্বর্গের দুয়ারে আসতেই দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। অনু-শোচনায় রাগে দুঃখে মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। বার বার মনে পড়তে লাগল আমার শিকারের যিনি গুরু তাঁর বারণ, যেন

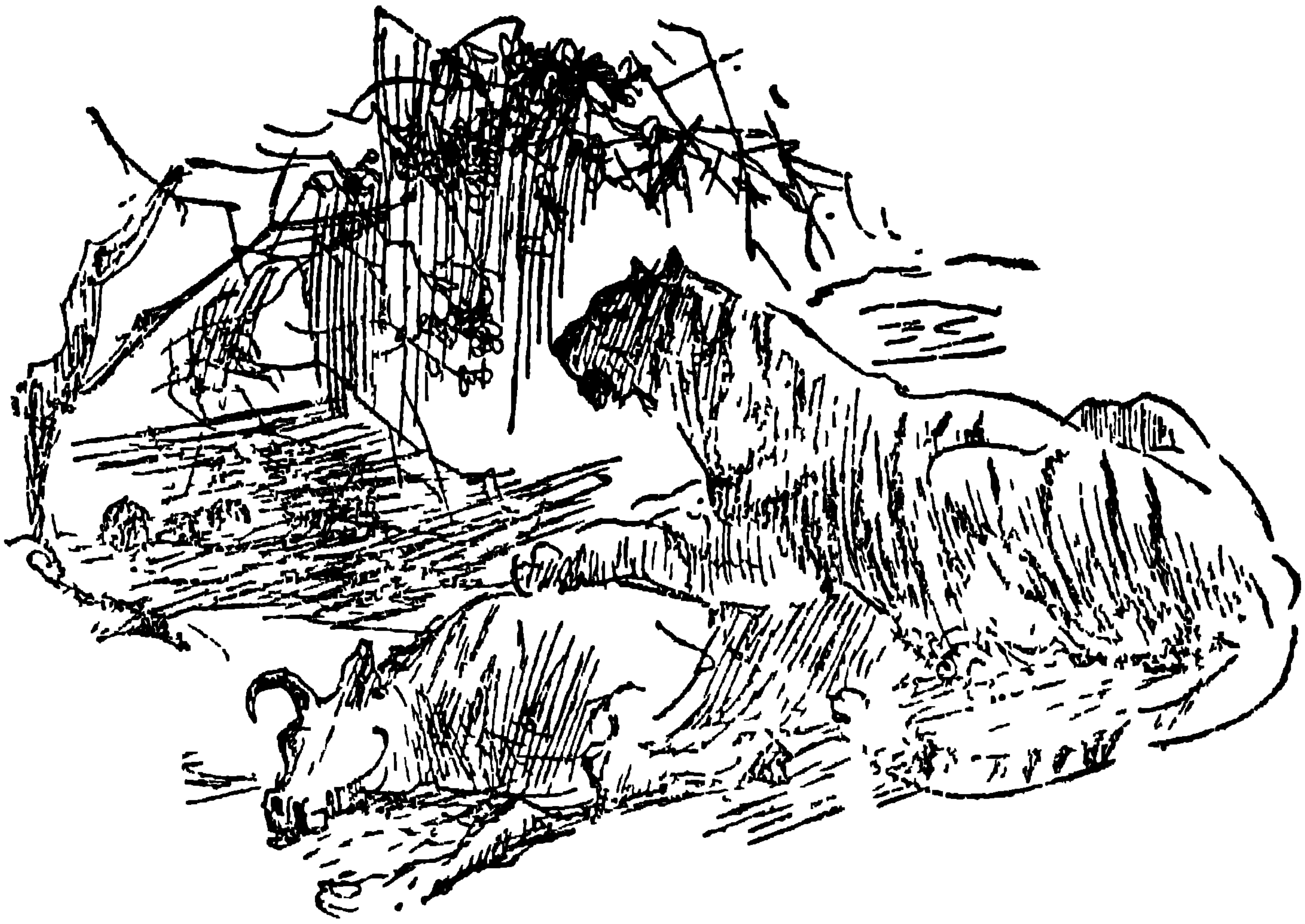

কখনও বাঘ শিকারে অজানা কাউকে সঙ্গী না নিই। একে অপরের জীবনের দায়িত্ব নিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ অন্য জনের অসতর্ক মুহূর্তে যদি কোন শব্দ হয়।

নিজেব শিকার করা মাংস খেতে সে ফিরে আসবে না এ বিশ্বাস হল না, সে নিশ্চয়ই আবার আসবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আশা ও ধৈর্য সম্বল কবে উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষায় রইলাম রাত একটা পর্যন্ত। বড় বাঘের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়, তাই তাদের রীতি নীতি ভাল করে জানবার সুযোগ তখনও আমার হয়নি, যদিও কয়েকটি চিতা ও নেকড়ে তাদের প্রাণ হারিয়েছে আমাব বন্দুকের গুলিতে।

রাত দেড়টা, জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে এসেছে। হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে দেখি একপাল বুনো শুয়োর সারা ক্ষেত ছেয়ে ফেলেছে এবং চরতে চরতে তারা ক্রমশঃ এগিয়ে এল। হিতোপদেশের 'যৎধ্রুবাণি পরিত্যজ্য' ইত্যাদি মনে করে সামনে সবচেয়ে যেটা বড় সেটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম এবং দৌড়ে পালাচ্ছে এমনি আরো দুটিকে। পর পর তিনটি শুয়ে পড়ল। বন্দুকের শব্দ শুনে

গ্রামবাসীরা উল্লাসের ধ্বনি করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, তারাও গ্রামে আমারই মত অপেক্ষায় ছিল। দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলো উচ্চকণ্ঠে তারা কাছে আসবে কিনা, অর্থাৎ আসা নিরাপদ কি না। সম্মতি পেয়ে কাছে এল। গোয়ালার মূর্খতা শুনে তাকে এই মারে আর কি। যাই হোক, বড় তিনটি শুয়োরের মাংস পেয়ে তাদের আনন্দ কম হল না, কিন্তু আমার মনে রইল শুধু সীমাহীন ক্ষোভ, বিফলতা ও গুরুবাক্য না শোনার গ্লানি।

দুই

একোয়া

জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজ যখন পিছন ফিরে চাই, কত কথাই মনে পড়ে। কতদিনের কত ঘটনা যা হয়তো তখন খাপছাড়া ছোট ঘটনামাত্রই ছিল, আজ তারা সুসম্বদ্ধ ছোট গল্পর রূপ নিয়ে অতীতের আঁধার থেকে স্মৃতির নয়নের সামনে এসে দাঁড়ায়। শিকারের অনেক সুযোগ জীবনে এসেছে এবং করেছিও প্রচুর। নেশার উন্মাদনায় শিকার করেছি, শিকারের জন্য শিকার-প্রাণীহত্যার জন্য নয়, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে বিবেক বার বার বলেছে, "এ অন্যায়, এ অত্যাচার, এ হত্যার অধিকার তোমার নেই, জগতে কারুর নেই।" প্রতিবারই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, না, আর নয়, কিন্তু রহস্যময় ঘন বন যখন রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি ও শিকার সম্ভাবনা নিয়ে সামনে এসেছে আবার ভুলেছি সে সঙ্কল্প। নেশা এমনিই জিনিস।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। বনেলী স্টেটের রাজা কীর্ত্যানন্দ সিংহ কুশী নদীর তীরে নেপালের বন্যাঞ্চল ঘেঁষা ছুটি গ্রাম ভাগলপুর খাসমহল থেকে বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। এ গ্রাম ছুটি নিয়ে, সেখানকার চাষ-আবাদ বন্ধ করে গ্রামছুটিকে তিনি বনে পরিণত করিয়েছিলেন, যাতে নেপালের বন্যাঞ্চল থেকে জন্তু জানোয়ার এই নতুন বনেও আসে এবং তিনি সেখানে মাঝে মাঝে শিকার করতে পারেন। প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৯৩৩ সালে তিনি সে বন্দোবস্ত ছেড়ে দেন। তখন সুপোলের উকিল প্রথিতনামা শ্রীঠাকুরপ্রসাদ তেওয়ারী সে গ্রাম ছুটি সরকারের কাছ থেকে বছরে চৌদ্দশ' টাকায় বন্দোবস্ত নেন, কিন্তু ছুবছর পর দরখাস্ত দেন যে, তাঁর টাকাটা মাফ করে দেওয়া হোক, কারণ, "বনগাধা"র উপদ্রবে ওখানে চাষ-আবাদ অসম্ভব। এই দরখাস্ত সমর্থন করে সুপোলের এস ডি ও শ্রীনন্দকিশোর সিংহ রিপোর্ট দেন এবং সে সব আমার কাছে আসে। বনগাধা শুনেই আমার ঔৎসুক্য জাগল। সুপোলের এস ডি ও'কে জিজ্ঞাসা করে লিখলাম বনগাধা কি? তিনি জবাব দিলেন "Wild asses," এতদিন এত জঙ্গলে ঘুরেছি, কই বনগাধার অস্তিত্বের চাক্ষুস প্রমাণ দূরে থাক, কখন তো শুনিও নি। শিকারী বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল। সে সময়কার লাটসাহেব, বড়লাট প্রভৃতি অনেকেরই শিকারের বন্দোবস্ত করিয়েছি ও সঙ্গে নিয়ে শিকার করেছি। বনগাধার রহস্য জানবার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কেম্প সাহেবকে গিয়ে বললাম। তিনি বললেন, ছুর্গম পথ, তুমি যেতে চাও যাও, গিয়ে তোমার মোটরগাড়ি ভেঙে এসো, তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে। কি ব্যাপার চাক্ষুষ দেখেও আসতে পারবে উকিল ভদ্র লোকের জমির তদন্ত হিসাবে।

১৯৩৬ সালের মে মাস। গঙ্গা পার হয়ে ভি—৮ ফোর্ডে সুপোলে গিয়ে পৌঁছিলাম এবং সেখান থেকে আরো উত্তরে বীরনগর

থানার উদ্দেশে রওনা হলাম। ১৯০১-১৯০৪ সালে আমার কাকা মাধিপুরাতে এস ডি ও ছিলেন। আমার কৈশোরের সেই পরিচিত অঞ্চলগুলির সেদিনকার রূপ ও আজকের রূপে কত প্রভেদ! ১৯৩৪ সালে উত্তর বিহার ভূমিকম্পের যে রুদ্রলীলা প্রত্যক্ষ করেছে তার স্বাক্ষর আজও রয়েছে বিদ্যমান তাব শতধাবিদীর্ণ মাটিতে। উর্বর পলিমাটি যেখানে যেখানে বিদীর্ণ হয়েছে, সেই ক্ষতর উপর জেগে উঠেছে বালুকারাশি। সেই দুস্তর বালুকারাশি কোন মতে পার হতেই চোখে পড়ল বিস্তীর্ণ ঝাউ, কাশ ও পাটেরের (হোগলা) বনের মধ্যে দ্বীপের মত জেগে রয়েছে ছোট ছোট গ্রাম। এই বন্য এলাকায় এক সময় গঞ্জ, বাজাব ও সমৃদ্ধিশালী বসতি ছিল, যে গঞ্জে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট ও শস্যের ক্রয় বিক্রয় চলতো। বন্যাস্ফীত কুশীর ধ্বংসলীলায় সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। মাঝে মাঝে মৃত-স্রোতা ক্ষীণ জলরেখা রয়ে গেছে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে ভরা। উর্বরা ক্ষেত সব ঝাউ, কাশ ও পাটেরের বনে ছেয়ে গেছে দূর দূরান্ত পর্যন্ত। মাঝে মাঝে এক একটা ১১৫।১৫০ হাত উঁচু নারিকেল গাছ রয়ে গেছে যারা সমৃদ্ধি ও সুদিনে প্রতিষ্ঠিত। পঁচিশ-ত্রিশ মাইল অতিক্রম করে বীবনগর পৌঁছলাম। দারোগাকে আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল, পৌঁছে দেখি বীরনগর থানার দরোগাজী প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায়। বীর-নগর গ্রাম ও থানা নেপাল সীমান্তে কুশীর উপকূলে। যে জমির তদন্ত করতে হবে তা কুশীর ওপারে নেপালের সংলগ্ন। নদী পার হয়েও অনেক পথ, কোন তৈরি রাস্তা নেই, যানবাহনও দুর্লভ, তাই ঠিক হল দারোগাজী ও আমি নৌকায় খেয়া পার হব এবং জমিদারের হাতী সাঁতরে নদী পার হয়ে ওপারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে এবং পরিদর্শনের স্থানে আমাদের নিয়ে যাবে।

খরস্রোতা প্রশস্তাঙ্গী কুশীর তীরে আমরা পৌঁছলাম। নদী এখানে তিন মাইল প্রশস্ত। নদীর ওপারেই দেখা যায় তুষার-

কিরীট নগাধিরাজের ধ্যানগম্ভীর রূপ। আকাশের পটভূমিকা সন্ধ্যার আভায় রক্তিমাভ। নদীতে নামতে গিয়ে অতর্কিতে হাতীর পা পিছলে গেল। সেই যে সে ভয়ে আর্তনাদ করে ফিরে দাঁড়াল, অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর জলে নামান গেল না। অগত্যা হাতীর আশা ত্যাগ করে আমরা দুজনেই খেয়া পার হলাম যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাছেই জমিদারেব এক ভাণ্ডারে রাতের আশ্রয় নিলাম। বিকেলে কালবৈশাখীর ঝড ও অল্প বৃষ্টি হয়ে গেছে। অন্ধকাব হতেই এমন শীত করতে লাগল যে, তিন-চারখানি কম্বল যা দাবোগাজী জোগাড় করেছিলেন তাতে শীত মানল না, শেষে আগুন জ্বালাতে হল সেই মে মাসে। এ যেন নগাধিরাজের রাজ্যে প্রবেশ করায় তাঁর প্রথম অভ্যর্থনা।

রাত্রে কিছু দুধ জোগাড় করা গিয়েছিল। তারই অবশিষ্টাংশ খেয়ে সকালে বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে। পথ ঘন বনের ভিতর দিয়ে। খয়ের, আমন ইত্যাদির বন। গ্রামে পৌছন গেল। গ্রাম দুটি বেশ বড়। বেলা এগারটায় তদন্ত শেষ হল। দেখা গেল আবাদের চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু ফসল হবার কোন চিহ্ন নেই। সম্ভবত শস্য গজাবার আগেই কোন বন্যজন্তু তাদের নির্মূল করে খেয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম বনগাধা অর্থে নীলগাই! এরা এবং বনগরু শস্য নষ্ট করে। এখানে যে-সব গ্রাম ছিল, ম্যালেরিয়া এবং কুশীর বন্যার প্রকোপে সে-সব উজাড় হয়ে গেছে। যারা রক্ষা পেয়েছে, তারা ঘরবাড়ি গরু-বাছুর ছেড়ে দিয়ে আত্ম-রক্ষাব জন্য পালিয়ে গেছে। যে সব গরু-বাছুর ছেড়ে গিয়েছে তারা বনে আশ্রয় নিয়েছে, তাদেরই বংশধর এই বনগরু। তারা ভীরুস্বভাব হরিণের মত হয়ে গেছে, দিনে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, রাত্রের অন্ধকারে এসে গ্রামের শস্য নষ্ট করে যায়। যা জানবার ছিল জেনে ফিরে যাওয়া মনস্থ করে বীরনগরের অভিমুখে চলতে শুরু করেছি। দেখলাম, মাঝে মাঝে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা জমিতে

আবাদ হয়েছে। শুনলাম কীর্ত্যানন্দের প্রাইভেট সেক্রেটারি বাবু রঘুবর দয়ালের জমি। কাঁটাতার মাটি থেকে তিন ফুট উঁচুতে। বুঝলাম গরু বা বড় হরিণ জাতীয় কোন জন্তুর প্রবেশপথ নিরোধ করা হয়েছে, যারা মাথা নত করতে জানে না। কাঁটার উপর দিয়ে মাথা বাড়াবে, তাতে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সূর্যবংশের বীরদের মত মাথা নত করবে না।

দারোগাজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে পথ হেঁটে চলেছি। এক জায়গায় ঘন বনে ঘেরা একটু শ্যামল প্রাঙ্গণ, ইংরাজীতে যাকে বলে glade, সেখানে হঠাৎ দেখি প্রকাণ্ড এক নীলগাই গাছের ছায়ায় শুয়ে রয়েছে। দেখে প্রথমেই মনে হল মরা, কিন্তু শকুন শেয়াল না দেখে বুঝলাম মরে নি। দারোগাজীকে বললাম, "ও হচ্ছে যূথ পরিত্যক্ত যূথপতি, যাকে বলে একোয়া"। প্রকৃতি রাজ্যের জীব যারা তাদের মধ্যে দেখা যায় একাধিপত্যের সহজাত প্রবৃত্তি। আমি একাই ভোগ করব, আর কাউকে দেব না এতটুকুও, আমিই প্রধান, এই তাদের মনোবৃত্তি। বাঘ হরিণ শুয়োর থেকে আরম্ভ করে হনুমান বানর খরগোস বিড়ালদের মধ্যেও দেখা যায়· শাবক জন্ম দেবার পরই. মা তার সন্তানকে সযত্নে লুকিয়ে রাখে বলবান প্রচণ্ড বাপের দৃষ্টির সামনে থেকে, কারণ ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্ভাবনা মাত্রকে সমূলে বিনাশ করতে চায় পুরুষ জানোয়ার। হয়তো মা বাঘিনী তার বাচ্চাদের সঙ্গে ঘুরছে, এমন সময় এল বাঘ, তখনই বাঘিনী তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় নিজের সঙ্গে বাচ্চাদের পলায়নের সুযোগ দিয়ে। ক্রমে পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে বেড়ে ওঠে যৌবনপ্রাপ্ত কালকের দিনের শিশু-শাবক। আমরা জানি, জন্তুদের অনেক শ্রেণী আছে যারা যূথবদ্ধভাবে থাকে, যেমন হাতী শুয়োর হরিণ বাইসন প্রভৃতি, তাদের মধ্যে একজন থাকে যূথপতি। প্রাপ্তযৌবন শক্তিশালী নবাগত একদিন হয়তো দৃষ্টিগোচর হয় যূথপতির। তখনই সে তাকে আক্রমণ করে, হয়তো নবীন

প্রাচীনের শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে আবার আত্মগোপন করে দলের ভিড়ে বা অন্যত্র, কিন্তু মনে জেগে থাকে তার প্রতিহিংসার আগুন। গোপনে সে শক্তি সঞ্চয় করে, খোঁজে তার উপযুক্ত অবসর। মহাকালের বিধানে যূথপতির পরাক্রমের সূর্য একদিন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে তার নিজেরও অগোচরে। আবার একদিন যূথপতির দৃষ্টিগোচর হয় নবীন, আবার তাকে আক্রমণ করে। এবার যৌবনমদগর্বিত নবীন তাকে আহ্বান করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। কত সময় দিনের পর দিন চলে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ, যূথের অন্যান্য সকলে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকে উৎসুক নয়নে নিরপেক্ষ হয়ে, কখনও বা তারা ধীরে দূরে চলে যায়। এবারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নবীন হয় জয়ী, প্রাচীনকে পরাজিত করে তাকে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে বিজয়গর্বে সে অধিকার করে যূথপতির আসন। দলশুদ্ধ সকলে স্বীকার করে নেয় তাকে, নির্মমভাবে পরিত্যাগ করে প্রাচীনকে, যে এতদিন ছিল তাদের সর্বেসর্বা, তাদের কত দুর্দিনের রক্ষাকর্তা, অধিনায়ক। পশু জগতের এই নিয়ম—"Survival of the fittest". যূথ পরিত্যক্ত দলপতি তখন দেখে সে একা, সে একেবারেই নিঃসঙ্গ একা, যে দলকে সে এতদিন তার আপন বলে জেনে এসেছে, যেখানে তারই ছিল সব প্রতিপত্তি, সে তাদের কেউ নয়। এতদিন যাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ছিল, তাদের ছেড়ে সে যেতেও পারে না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমাধি বৈশ্যের মত তাদেরই আসেপাশে ঘুরে বেড়ায়, যদি কখনও বিপদের সম্ভাবনা দেখে, নিজেকে রোধ করতে না পেরে দলের কাছে ছুটে যায় বিপদের বার্তা নিয়ে। নতুন যূথপতি দ্বিগুণ আক্রোশে আক্রমণ করে তাকে, আবার সে ফিরে আসে। তখন সে জগতের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। "একোয়া" বাঘ, "একোয়া" হাতী, বা শুয়োর অত্যন্ত হিংস্র হয়। মনের একান্ত গ্লানিতে সে খাওয়া ত্যাগ করে এবং ক্রমে সর্বাগ্রে নষ্ট হয় তার দৃষ্টিশক্তি। সে এক জায়গায় তখন বসে পড়ে। তার

অবস্থা বুঝে শকুন শেয়াল তার আসেপাশে এসে জোটে। অবস্থাটা কতদূর দেখবার জন্য শেয়াল সন্তর্পণে কাছে আসে। টের পেয়ে একোয়া করে ওঠে গর্জন, ভয়ে পালায় শেয়াল। ভগবান অসীম দয়ালু, ক্রমে তার সব বোধশক্তি লোপ পায়, তখন জীবিত অবস্থাতেই শেয়াল-শকুনে তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, এই তার শেষ পরিণতি। এই নীলগাই হচ্ছে সেই যূথপরিত্যক্ত। এর যদি সেই শেষ অবস্থা এসে থাকে, অবশ্যই একে মারব, নয়তো অযথা ওর প্রাণ নেবার ইচ্ছা বা উৎসাহ আমার নেই। সব শুনে দারোগাজী খুব হাসলেন, বললেন, "আপনি এ সব কি বলছেন ? এও কি সত্যি হয় ?" বিশ্বাস হল না তাঁর। বললাম, চলুন দেখবেন। আমরা আরো কিছু অগ্রসর হতেই নীলগাইটা উঠে দাঁড়াল এবং ছুটে বনের মধ্যে ঢুকে গেল ; কিন্তু অল্প পরেই দৌড়ে পালিয়ে এল, তাঁর পিছনে তাড়া করে এল আরেকটি সতেজ নীলগাই ; এবং আসেপাশে দেখা গেল আরো অনেকগুলি। আমাদের সাড়া পেয়ে তারা আবার বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল, কেবল যে একোয়া সে করুণ চোখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সে জানাতে চায়—"দেখো, এদেরই ভাল করতে গেলাম, কিন্তু আমাব ভাল ওরা চায় না, আমি আজ কেউ নই।"

দারোগাজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, নতুন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ হল বটে, এ আগে কখনও শুনিনি। উপসংহারে তাঁকে বললাম যে, যে মানুষ পশুপ্রকৃতির উপর উঠতে পারেনি ·সেও এমনি। অনেক বাদশাহ তাই প্রাণ হারিয়েছেন পুত্রের হাতে। প্রাচীন ভারতের মনীষীরা তাই যৌবরাজ্যে অভিষেক ও বানপ্রস্থের বিধান দিয়েছেন।

তিন

শিকারী বন্ধু কালীপ্রসাদ সিংহ

পথ চলতে গেলে যেমন পথের নিশানা জানা প্রয়োজন, তেমনি কোন কিছু শিক্ষা লাভ করতে গেলে গুরুর প্রয়োজন, তা সে লেখাপড়া সঙ্গীত ললিতকলা বিজ্ঞান দর্শন যাই হোক। শিকারের ক্ষেত্রেও তাই। এ সম্বন্ধে জ্ঞানালোক দিয়ে যারা আমার পথ করেছেন সুগম, তাঁরা সকলেই আমার গুরু। মনে পড়ে বাঁশডিহার বন্ধুবর বাবু কালীপ্রসাদ সিংহকে। তিনি প্রাচীন ও অভিজ্ঞ শিকারী ছিলেন। অমায়িক, হাসিখুসি, উদার ছিল তাঁর স্বভাব, অফুরন্ত ছিল তাঁর শিকারের উৎসাহ ও উদ্যম।

গয়া জেলার আওরাঙ্গাবাদ সাবডিভিশানের দক্ষিণাংশ। পূবে দেও, পশ্চিমে নবীনগর, উত্তরে পাওয়াই ও দক্ষিণে পালামৌ জেলার সীমানা। এই এলাকার সার্ভে ও খানাপুরীর ভার পড়েছিল আমার উপর ১৯১২ সালে। আম্বা ডাকঘরের সংলগ্ন গ্রাম দাদপাতে ছিল আমার হেড্ কোয়ার্টার। গয়া পালামৌ দুই জেলার মাঝে কোথাও গ্রাম্য পায়েচলা পথ এঁকে নিয়েছে দুই জেলার সীমানা, কোথাও বা ক্ষেতের আল ভাগ করে দিয়েছে দুই জেলাকে। গ্রাম ছাড়িয়ে যেখানে পাহাড় জঙ্গল সেখানে পার্বত্য নদী-নালা টেনে দিয়েছে সীমারেখা, কোথাও কোথাও বা উঁচু পাহাড়ের দুই দিকের ঢালু গা দুই জেলার অধিকারে। পর্বতমালার সবটাই প্রায় পালামৌ সীমানায়, তবুও দু-একটি ছোট পাহাড়, ওদেশে যাকে বলে টোংরা টুংরী এবং ঘুটঘুরী, যেন মালা থেকে ছিঁড়ে ছিটকে এসে গয়ার আবাদী গ্রামে ঘেরা উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে এসে পড়েছে।

নবীনগরের দক্ষিণে দামোরা ও ডোঙা দুটি গ্রাম ঘন বনে ভরা, বসতিহীন (বে-চিরাগী)। এই গ্রাম দুটিকে গয়া পালামৌ উভয় জেলাই দাবি করে এবং তাই নিয়ে সীমানা সংক্রান্ত বিবাদের তদন্তে গেছি।

পাহাড় ও বনে ঘেরা ডোঙায় বিশালায়তন প্রস্তরময় থাড্ডা পাহাড় যেন পৌরাণিক যুগের সুর অসুর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ, তার শিখরের উপর দু-চারটি গাছ। এই থাড্ডার পায়ের কাছে এসে লেগেছে পাহাড়ের ঢেউ, পশ্চিমে নেমে গেছে ঢালু। শিবলিঙ্গের গোড়ায় বড় বড় পাথরের চাঙ ওরই শিখর থেকে স্থানভ্রষ্ট হয়ে এসে পড়ে আছে, তার মাঝে মাঝে চিড়চিড়ির বন। ক্রমে ঢালুতে দেখা যায় মহুয়া, আম ও অন্যান্য বড় গাছ ও লতা। বসন্ত সমাগমে চিড়চিড়ি বনে লেগেছে নতুন পাতার সবুজের সমারোহ। রতেনের লতা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে গেছে ছেয়ে, তারও নতুন পাতা বেরিয়েছে— রং তার সাদা। মহুয়া ফুল সবে ফুটতে শুরু করেছে। থাড্ডার পূব-উত্তর প্রান্তে যেখানে অন্য পাহাড়ের ঢেউ এসে লেগেছে তারই ঠিক গোড়ায়, পাহাড়ে ঢালু গা যেখানে সমতল দেশের দিকে ছুটে নেমে গেছে সেইস্থানটিতে অর্ধচক্রাকার মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা। বর্ষার জলধারা পাহাড়ের গা ধুয়ে যখন নেমে আসে এই বাঁধের বন্ধনে পড়ে যায় ধরা। বহুদিন, বহু বছর আগে যখন এখানে আবাদী গ্রাম ছিল তখন জলসেচ ও ব্যবহারের জন্য এই কৃত্রিম জলাশয়টি তৈরি হয়েছিল। জনশ্রুতি, বর্গীর হাঙ্গামার সময় এ গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, জল এসে বিস্তার করে তার আধিপাত্য। বাঁধের উপর গজিয়ে ওঠে চিড়চিড়ি, রতেন ইত্যাদি। তাদের শিকড় শত শত বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরে বাঁধের ভিজে মাটি, তাই এতদিনের অনাদৃত অসংস্কৃত অবস্থায়ও সে বাঁধ বর্ষার প্লাবনে ধুয়ে যায়নি। বাঁধের ভিতর দিকে পাহাড় থেকে ধুয়ে আনা বালি, মাটি, শুকনো পাতায় ক্রমে ভরে আসছে, তবুও শীতের শেষ পর্যন্ত

তার অগভীর জল জমে থাকে, তারপর দেখা দেয় পাঁক, গ্রীষ্মের দিনে তাও শুখিয়ে অজস্র রেখায় ফেটে ওঠে শুষ্ক হ্রদের বক্ষ। বাঁধের বাইরের দিকের ঢালুতে বর্ষার অঙ্গুলিচিহ্ন বিদ্যমান অজস্র খোয়াইয়ে! পূর্বকালের আবাদের ক্ষীণ চিহ্ন বিদ্যমান কোথাও কোথাও।

জায়গাটা পরিদর্শন করছি, হঠাৎ দেখলাম প্রকাণ্ড বড় এক জানোয়ারের বসে-থাকা শরীরের ছাপ পাঁকের উপর। এতবড় জানোয়ার পাঁকের উপর, মোষ ছাড়া আর কি হবে। মনে করলাম নিশ্চয়ই মোষ এখানে চরতে আসে, তাই যদি হয়, তাহলে আসেপাশেই যারা মোষ চরায় তাদের কাউকে পাব মোষের পালের সঙ্গে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারব যে এখনকার খাজনা কে এবং কোন্ গ্রামের জমিদার নিয়ে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য যে, মোষ বা চরওয়াহা দূরে থাক, কোন জন-মানবের চিহ্ন পর্যন্ত পেলাম না চার পাঁচ মাইলের ভিতরে। সন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে, বন্ধুবর বাঁশডিহার বাবু কালীপ্রসাদ সিংহের সঙ্গে দেখা। সারাদিনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প হল সব শুনে তিনি বললেন, ওটা মোষের বসার দাগ নয়, ও বনে বাঘের ভয়ে কোন গরু-মোষ চরে না, বিশেষ করে থাড্ডার দক্ষিণে বাঘের গর্ত বা মান, গরমের দিনে সেখানে বাঘ আশ্রয় নেয়। ওটা হচ্ছে শুয়োরের চিহ্ন।

'শুয়োরের? না না, তা হতেই পারে না, অত প্রকাণ্ড শুয়োর?' কালীবাবু পুরানো শিকারী, শিকারের তাঁর বিশেষ সখ ও অভিজ্ঞতা ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর দুটি অনুচর ছিল, নাম দলেলওয়া ও বাসদেওয়া। তারা জাতে বহেলিয়া বা মির শিকার; শিকারই যাদের জীবিকা, অর্থাৎ ব্যধ। তীক্ষ্ণ তাদের দৃষ্টি এবং ক্ষিপ্র লঘু গতি। তিনি তাদেব মধ্যে দলেলওয়াকে ডেকে বললেন—যা এখনি ডোঙাতে, দেখে আয় কি জানোয়ার জলায় আসে, কত বড়, একা না

অনেক, কত রাত্রে আসে। সব জেনে সোজা ডিপ্‌টি সাহেবের ক্যাম্পে খবর দিয়ে আসবি।"

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে এমন সময়ে দলেলওয়া এসে খবর দিল যে, একটা একোয়া শুয়োর রোজ প্রথম রাত্রে আসে। তখনই ঠিক হ'ল রাত্রে সেখানে যাব এবং খবর পেয়ে এই অনুসারে শিকারের বন্দোবস্তের ভার নিলেন কালীবাবু।

বিকাল চারটের মধ্যে রওনা হয়ে বাঁধের কিনারায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখনও বেলা ডোবেনি। বাঁধের বাইরের দিকে পাহাড়ের ঠিক মুখোমুখি বাঁধের সমান লেভেলে মাচা বাঁধিয়েছেন কালীবাবু এবং তার উপর ফরাস পেতে বাতের মত প্রস্তুত হয়ে বসে তিনি অপেক্ষা করছেন। সামনে বাঁধের উপরের গাছপালা বচনা করেছে যবনিকা, যাব পেছনে আমরা আত্মগোপন করব।

কালীবাবুব পাশে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল প্রতীক্ষায়। বসন্তের ছোঁয়া লেগে জেগে উঠেছে অরণ্যপ্রকৃতি। নাম-গোত্রহীন বৃক্ষলতা সকলে পরেছে ফুলের সাজ, বন্য করমচা ফুল অকাতরে ঢেলে দিয়েছে তার সুরভি বাতাসে বাতাসে। শুক্লপক্ষের চাঁদ তখনও পূব আকাশে। রাত বেশি হয়নি, বড় জোব আটটা হবে; হঠাৎ দেখি পাহাড়েব কোলে জঙ্গল থেকে বিশালকায় এক শুয়োর সন্তর্পণে বেরিযে আসছে জলের দিকে। দু এক পা এগোয় আর আমাদেব দিকে একবার ডান কান ঘুরিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। কোন সন্দেহপূর্ণ শব্দের আভাস আসে নাকি কোথাও থেকে তাই শোনে, আবার দু এক পা আসে আবার অন্যদিকে কান দিয়ে শোনে বিপদ-সূচক কোন শব্দ আছে নাকি। এমনি করে ধীর মন্থর গতিতে এক পা এক-পা করে এগিয়ে আসে। বুঝলাম শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সারাগায়ে কাদা শুকিয়ে চড়চড়ে হযে আছে, চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে সাদা। সারাদিন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল তেতে ওঠা পাহাড়ের গরম ও তৃষ্ণা সহ্য করে রাত্রের অন্ধকারে এগিয়ে আসছে জল খেতে।

২

হঠাৎ কি যে তার সন্দেহ জাগল অথবা তার কোনও অন্তর প্রকৃতি তাকে মানা করল, সে জলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল এবং জল না খেয়েই ফিরে দাঁড়াল বনের দিকে ফিরে যাবে বলে, আমাদের দিকে আড় হয়ে। কালীবাবু ইসারা করলেন, সে আর আসবে না কাছে, মারতে হয়তো এখনই মারুন। তুলে নিলাম আমার জেফরির কর্ডাইট রাইফেল '৩৩৩ বোর এবং সামনের পায়ের উপরে মেরুদণ্ডের ঠিক নীচে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি যে তার

গায়ে লেগে পার হয়ে গেল তার প্রতিধ্বনি পেলাম। শুয়োবটি একেবারে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখি তখনও মরেনি। দলেলওয়া বলল, 'আব গুলি নষ্ট কববেন না বাবু ওব পেছনে, ও এখনি মরবে।' গুলির শব্দ শুনে লোকজন যাবা অদূবে অপেক্ষা করছিল তাবা সাড়া দিল এবং কাছে এলো। মহা উল্লাসে বার জন মিলে শুয়োরেব ছ মণ ওজনের বিশাল দেহ বহন করে নিযে গেল। তার মাথাব চামড়াটা কেটে বাঁধাব বলে পাঠালাম নর্থ ওযেস্টার্ণ ট্যানাবিতে। শুধু mask এব (মুখেব চামড়াব) ওজন হল পঁযত্রিশ সেব এবং দাঁত তু'টি ৯ ইঞ্চিবও কিছু বেশি। অতি পুরানো 'একোযা' শূয়োব।

এ শিকারেব কথা শুনে পিতৃতুল্য কাকামণি চুপ কবে বইলেন কিছুক্ষণ, তাবপব আমাকে প্রতিজ্ঞা করালেন যে জল খেতে এসেছে তৃষ্ণার্ত এমন পশুকে যেন কখনও হত্যা না কবি।

চার

মরণের ভয়

পাঁচ বছর কেটে গেছে। গয়ার কাজ শেষ করে তখন পালামৌ অঞ্চলে আমার কর্মস্থল। ১৯১৭-র গ্রীষ্মকাল। পালামৌ এবং গয়ার দোসীমানাতে সাবানে গ্রামে আমার ক্যাম্প। সবে হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরে ঘোড়া থেকে নামছি, এমন সময় একটি লোক ছুটে এসে হাতে একখানি চিঠি দিল। বন্ধুবর কালীবাবুর চিঠি। তিনি লিখেছেন, "বাঘে একটা বজ্রকীট মেরেছে, আমি প্রস্তুত হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। পথের নিশানা আমার এই লোক দেবে, আপনি পত্রপাঠ চলে আসুন, সন্ধ্যার পূর্বে পৌঁছান চাই।"

লোকটির কাছে সব শুনে নিয়ে ডাবল ব্যারেল এক্সপ্রেস ৫০০ সহিসের হাতে দিয়ে তাকে সোজা এগিয়ে যেতে বললাম। হাতে কিছু জরুরী কাজ ছিল, তাড়াতাড়ি সেরে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়ে তার পিঠে চললাম কালীপ্রসাদের উদ্দেশে। পথে সহিসের হাত থেকে রাইফেল নিয়ে নিলাম। অবারিত মাঠের পরে মাঠ পার হয়ে চলেছি। এক জায়গায় দেখি একজন লোক দাঁড়িয়ে। সে আমাকে থামিয়ে বলল, "ওই যে দূরে লোকটাকে দেখছেন ওর কাছ দিয়ে আপনাকে যেতে হবে।" দ্বিতীয় লোকটি দেখিয়ে দিল তৃতীয় ব্যক্তি দূরে দাঁড়িয়ে, এমনি করে কালীবাবুর নির্দেশে দাঁড়ান ন-দশ জন পার হয়ে যেখানে পৌঁছলাম সেখানে সমতল জমি শেষ হয়ে পার্বত্য ভূমি শুরু হয়েছে। একটা বড় পাথরের উপর কালীবাবু যেন সতৃষ্ণনয়নে আমার প্রতীক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, "আমি বহুদূর থেকে আপনার গতি লক্ষ্য করছি। এ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বাঘের খবর পাচ্ছি। আপনি কাছেই ক্যাম্পে আছেন, খবর পেয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম বাঘের,

যাতে এই সুযোগে শিকার করা চলে। এমন সময় শুনতে পেলাম কাল বড় টাইগার একটা বজ্রকীট মেরে অর্ধেকটা খেয়ে গেছে। এখানে পার্বত্য স্রোতস্বতী এ সময় শুকিয়ে যায়। দু-চার জায়গায় মাত্র জল থাকে, সেইখানে সব জন্তু-জানোয়ার আসে জল খেতে, বাঘও সেই সুযোগে শিকার করে, জলও খায়। তা আমি অন্যান্য সব জল বালি চাপা দিইয়ে দিয়েছি, কেবল যে জলের কাছে বজ্রকীটটা পড়ে আছে সেখানটা ছাড়া। বাঘ আজ নিশ্চয়ই আসবে সেখানে, চলুন আমরা গিয়ে বসি।"

সেই থাড্ডা পাহাড়। যে দিকটা পালামৌর দিকে তার কাছে অন্য পাহাড়ের কাছ ঘেঁসে একটি পার্বত্য স্রোতস্বতীর বাঁক ইংরেজী অক্ষর L-র মত। তারই কোণে বাঁধা হয়েছে অনুচ্চ মাচা। শিকারের মাচা এমনভাবে বাঁধতে হয় যাতে জঙ্গলের অন্যান্য গাছের মধ্যে মিশে থাকে। তাই আঠার ফুটের বেশি উঁচু হয় না, শুদ্ধ চারটি খুঁটির উপর একটি ফ্রেম, শিকারী তার উপরে বসলে দূর থেকে সদ্য কেটে আনা টাটকা ডাল পালা দিয়ে চারিপাশ ঘিরে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ মাটি থেকে আমরা জন্তু-জানোয়ারকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত তাতে রাতের স্বল্পালোকে বন্দুকের নিশানা ঠিকমত বসে না মাচা বেশি উঁচু হলে। লক্ষ্য বস্তু বা টারগেট্ যে কেবল নতুন রকম দেখায় তা নয়, জন্তুর যে অঙ্গ শিকারীর লক্ষ্যস্থল তা পাওয়া যায় না। স্বভাবতঃ বন্য জন্তুর সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি সামনে ও চারিপাশেই দেখে, বিশেষ কোনও কারণে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হলে তারা উপরের দিকে চায় না। আমরা মাচার উপর গিয়ে বসলাম। সঙ্গের লোকজন সব চলে গেল। আমাদের বাঁ-পাশে একটা সতেজ রতেনের লতার ঝাড়। সামনে বালির উপর পড়ে রয়েছে মরা বজ্রকীটের লৌহবর্মের মত খোলস। দীপহীন রাতের অন্ধকারে সাদা-বালির উপর যখন বাঘ আসবে, তখন তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাব। বজ্রকীটের ইংরেজী নাম "অ্যান্ট ইটার"।

উৎসুক আগ্রহে বসে আছি আমরা দুজন। রাত্রি গভীর হয়ে আসছে। শব্দহীন অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ কানে এলো শুকনো বালির উপর পায়ের খস্ খস্ শব্দ। বুঝলাম সে আসছে, আশা করে রইলাম সামনের জলের ধারে সে আসবে। কিন্তু তা না এসে কিছুক্ষণ পরে সব স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপরই রতেন লতার আড়ালে শুনি চক্ চক্ চক্। কালীবাবুর অজানতে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে কোন পাথরের ফাটলে ক্ষীণ জলধারা যে ওখানে আছে তা কে জানতো। বাঘ তাই খেয়ে চলে গেল, তাকে না গেল দেখা, না এল সামনে, আমাদের হিসাবে মস্ত ভুল হয়ে গেল। আশায় আশায় সারা রাত কেটে গেল, পূর্বাঞ্চলে আলোর আভাস দেখা দিতে লোকজন এলো, সাড়া দিয়ে আমরাও নেমে এলাম। কালীবাবুর অনুশোচনার অন্ত নেই। যাই-হোক তিনি বল্লেন, "আজ রাত্রে জ্যান্ত মহিষ বেঁধে ওকে মারবোই। আপনি সন্ধ্যার আগেই আসবেন।"

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। সারাদিন কাজ করে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগেই গেলাম আগের দিনের সেই জায়গায়। একটি সবল মহিষ ও কয়েকজন লোক নিয়ে কালীবাবু আগেই অপেক্ষা করছিলেন। শিকারের নিয়ম শিকারে যে কাড়া বা মহিষ ব্যবহার হয় তা কখনও মেয়ে মহিষ হবে না। সাধারণতঃ দুজন মহিষটিকে নিয়ে যায়, একজন নিয়ে যায় বড় একটি ধাতু নির্মিত ঘণ্টা এবং আর একজন দূর থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যায় কচি ঘাস পাতা, তার খাবার জন্য, যাকে বলে ওরা 'পালরী'। যেখানে বাঁধা হয় সেখানকার ডাল-পালা ভাঙ্গা হয় না পাছে সন্দেহের উদ্রেক হয়। মাচার কাছে গিয়ে কালীবাবু বললেন, "কাল রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে আমার একটু কাসি হয়েছে, আজ আর শিকার নষ্ট করতে চাই না, দলেলওয়া রইল আপনার কাছে, আমি ফিরে চললাম।"

মহিষ বেঁধে ডাল-পালা দিয়ে আমাদের ঘিরে দিয়ে তিনি সঙ্গের লোকজনদের নিয়ে খুব জোরে জোরে কথা বলতে বলতে চলে গেলেন,

যেন আসপাশের জন্তুদের জানান দিয়ে গেলেন যে আমরা যাচ্ছি। তারা যাতে নিঃসন্দেহ হয় যে, বন এখন জনমানবহীন। আমাদের মাচার সামনেই বাঁকের মুখ কিছুটা বালি খোঁড়া হয়েছে, তাতে বালির ভিতরে গোপন ছিল যে সিক্ততা তা জমে জল হয়েছে এবং ঠিক ওপারে সাদা বালির উপরের একটা ছোট শাল গাছকে মাটির থেকে ন-দশ ইঞ্চি গোড়া রেখে কেটে ফেলা হযেছে। এই গোড়ার সঙ্গে শম্বর হরিণের কাঁচা চামড়ার দড়ি দিযে মহিষটির পা বাঁধা, যাতে বন্ধন দৃষ্টিগোচর না হয় বরং মনে হয় দল ছাড়া হয়ে রয়ে গেছে। মহিষটির গলায় একটি বড় ঘণ্টা বাঁধা। ঘাস ও কচি লতাপাতা চারটি সামনের একটা গাছে উঁচু কবে বাঁধা। যেই মহিষটি মাথা উঁচু করে সে সব খেতে যাবে অমনি তার গলার ঘণ্টা বেজে উঠবে ও স্তব্ধ বনে বহু দূব পর্যন্ত অণুবণিত হবে তার শব্দ এবং আকৃষ্ট করবে ক্ষুধার্ত বাঘকে।

লোকজন সব চলে যাচ্ছে। ও একা রয়ে গেল দেখে ভয়ার্ত মহিষ প্রাণপণে চেষ্টা করল তাদের সঙ্গে যেতে, চিৎকার করে ডাকল, যেন, বলতে চায় আমায় ফেলে যেও না। কিন্তু পা তার শক্ত করে বাঁধা, সে নিরুপায়। উঃ, মানুষ কি নিষ্ঠুব, কি উদাসীন। বনের মাথায় মাথায রাঙ্গা আলোব আবীর ছড়িয়ে সুর্যদেব অস্ত গেলেন। আঁধারের ঘন ছায়া নেমে এলো বনের উপর। প্রথমেই শোনা গেল নিস্তব্ধতা ভেদ করে সন্ধ্যাব পাখীব ডাক "টুপু, টুপু, টুপু, টুপু"। ত্রাসে মহিষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, শুনতে পাচ্ছি তার রুদ্ধ কণ্ঠের ভয়ার্ত শব্দ, খাবি খাওয়ার মত। কখনও বা এক ঝলক বাতাস দুলিয়ে দিয়ে যায় ডালপালা, শুকনা পাতা ঝরে পড়ে। তারি শব্দে চমকে ওঠে মহিষ, গলার ঘণ্টা বেজে ওঠে। মাটিতে বুক দিয়ে সে শুয়ে পড়ে যাতে শব্দ না হয়, কিন্তু বেশিক্ষণ তো একভাবে পারে না থাকতে, আবার উঠে দাঁড়ায়। ক্ষুধার তাড়নাতে বটে, নিজেকে ভোলাবার জন্যও বটে, সামনের লতাপাতা খেতে মুখ বাড়ায়, আবার ঘণ্টা বেজে

ওঠে, আবার সচকিত হয়ে ওঠে সে। তার এই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যুর প্রতীক্ষা দেখে বুকের রক্ত প্রবাহ যেন থেমে এলো আমার। ভগবান, একি পাপ করছি, একি নৃশংসতা। কিন্তু দ্বিতীয় মন তখনই আশ্বাস দেয়, হাতে বন্দুক আছে, ওকে মারবার আগেই বাঘকে শেষ করে দেব। দলেলওয়াকে বললাম, তুই ঘুমিয়ে নে, আমি বসে আছি। সে সোজা লম্বা হয়ে মাচার উপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল, যেন তার এই চির অভ্যস্ত শয্যা, এখানেই সে এমনি করে ঘুমোয়।

নিশ্চল পাথরের মত বসে আছি। রাত প্রায় দশটা। আকাশে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। পাহাড় কাঁপিয়ে ডেকে উঠল হুতোম "দুরগুম"। উড়ে এসে সোজা বসলো আমার মাচার বাঁ-পাশের খুঁটিতে, এতো কাছে যে হাত বাড়িয়ে তার মেটে রঙের উপর বাদামী ছিট ছিট দেহ ধরে ফেলতে পারি, সে টেরও পেল না আমার অস্তিত্ব। কিছু পরে তার সঙ্গিনী জলের ধারে বসে ডাকল "কর্-ব্-র্"। উত্তর দিয়ে এ উড়ে গেল তার কাছে, তার ডানার ঝাপটা লাগলো আমার গালে। তারা দূরে চলে গেল। মহিষের এতক্ষণে একটু আত্মবিশ্বাস এসেছে, ভাবছে এ যাত্রা হয় তো বেঁচে গেলাম। সে বসে রোমন্থন করছে। রাত প্রায় দুটো। আমাদের দক্ষিণে পাহাড়ের আড়ালে চাঁদ। দূর থেকে ভেসে এলো মৃদুস্বরে মন্দ্রকণ্ঠে "অ্যা-অ্যা-অ্যা"। কিছু পরে তারই প্রত্যুত্তর। বাঘের নানারকম ডাক আছে, এ তারই এক রূপ। দলেলওয়ার গায়ে হাত দিলাম, সে যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে বসে কানের কাছে মুখ এনে বলল "আসছে।" অন্ধকারের পটভূমিকায় ঘন কালো চিত্র ফুটে ওঠে মহিষের। সেও অনড় নিঃস্তব্ধ, ভয়ে তার হৃৎস্পন্দন থেমে এসেছে। সর্বশক্তি সজাগ করে বসে রয়েছি। সামনে এলেই তাকে মারবো, হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। দেখি মহিষটি লুটোপুটি খাচ্ছে বালির উপর এবং তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সাদা বালির উপর। তার মাথা

থেকে মেরুদণ্ড ভিন্ন করে দিয়ে ব্যাঘ্র মহাশয় তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে অন্যদিকে চেয়ে পিছনের দুই পায়ের উপর বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। বন্দুক তুলে নিয়ে তার ঘাড় লক্ষ্য করে গুলি করলাম, লাফিয়ে উঠে ঘুরে পড়ে গেল, তার জীবলীলা শেষ হ'ল। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বন থেকে বনান্তরে তখনও শোনা যাচ্ছে বন্দুকের গুলির প্রতিধ্বনি "হা হা-হা-হা"। এমন সময় দেখি মহিষের মৃতদেহ কিসে টানছে, কিন্তু শক্ত করে বাঁধা বলে তাকে মুক্ত করতে পারছে না। যেন জোরে পড়্ পড়্ করে তার দেহ ছিঁড়ে ফেলছে। চেয়ে দেখি কলো ছায়া। কি ব্যাপার? ওই তো বাঘটা পড়ে। এটা কি? দেখি বাঘিনী। বন্দুক তুলে দ্বিতীয় গুলি করলাম, তারও প্রাণহীন দেহ শুয়ে পড়ল। একই রাত্রে প্রায় একই সঙ্গে প্রাণ হারাল দু'জনে।

মেঘ না চাইতেই জল। একটা বাঘ শিকার করতে এসে এক জোড়া পাওয়া গেল, খুবই আনন্দ হবার কথা এবং হয়নি যে সে কথা বলি না। কিন্তু সে সব নিষ্প্রভ করে গ্লানিতে মন ভরে উঠল যে নিরীহ জীবন্ত প্রাণীকে বেঁধে মারলাম, তার প্রাণরক্ষা করতে পারল না আমার আগ্নেয় অস্ত্র বা আমার দক্ষতা।

পাঁচ

বাঘ কার ?

কর্মক্লান্ত দিনের শেষে মন চায় আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ প্রেমে স্নিগ্ধ ছুটির পরিবেশ। মাসের পর মাস আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সভ্য জগত থেকে বহুদূরে পালামৌর গহন অরণ্যে দিন যাপনের পর যেদিন সত্যিই সেটেলমেণ্টের কাজের অবসান হল, মন খুশিতে ভরে উঠল অচিরাগত ছুটির দিনের কল্পনায়। এমন সময় এলো আমার নির্বাসন দণ্ড সেটেলমেণ্ট অফিসারের হুকুম, "নগর-উটারীতে মিঃ কুটস অনেক পিছিয়ে পড়েছেন, তোমার যখন কাজ শেষ হয়ে গেছে, সেখানে যাও মিঃ কুটসের সাহায্যে।" যাযাবর জীবনের ছোট-খাট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নতুন বনবাসের পথে।

ছোটনাগপুরের, বিশেষত পালামৌর প্রথম বর্ষা সত্যিই "খর প্লাবনা, নব যৌবনা বরষা।" নববর্ষার অবিরাম বর্ষণ এর প্রস্তরময় বক্ষে আনে সিক্ততার প্লাবন, পাহাড় ঘেরা ছোটনাগপুরে অজস্র পার্বত্য নদীর ধমনীতে আনে প্রাণের প্রবাহ, দগ্ধ শুষ্কপত্রহীন অরণ্য প্রকৃতিতে জাগায় যৌবনেব পূর্ণতা, সবুজের সুষমায়। প্রথম বর্ষার দুর্দমনীয় বেগে নগর-উটারীর বসনা বাংলার দক্ষিণে গাম্ভারিয়া গ্রামে যেখানে আমার ক্যাম্প ছিল, সে সব গেছে ভেসে, ক্যাম্পের ভিতর চলেছে পাহাড়ের গা ধুয়ে নেমে আসা জলের প্রবাহ, জিনিসপত্র নিয়ে টেবিলের উপর অনাহারে কদিন কাটিয়ে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছি অপেক্ষাকৃত উঁচু গ্রাম মেনার ডাক-বাংলায় সহকর্মী মিঃ কুটসের পাশের ঘরে। তিনিও নিয়েছেন সেখানে আশ্রয়।

অ্যাটেসটেশানের কাজ চললো। আস-পাশের গ্রাম থেকে রোজ প্রায় হাজার-বারশ' লোক এসে জড় হয়। একদিন সকালে এই

কার্যোপলক্ষেই গ্রাম পরিদর্শনে গেছি, বেশি বাঘে একটি বড় বাছুর মেরেছে। কাছে গিয়ে ক্ষত চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখলাম, চিতা বাঘ। দীর্ঘদিন ধরে একই কাজ করে চলেছি, ভালও লাগছে না। শিকারের সম্ভাবনায় মন হয়ে উঠল চঞ্চল, মিস্টার কুটস যেখানে কাজ করছিলেন, সেখানে গিয়ে বললাম, চল আজ শিকার করা যাক। তিনিও সানন্দে রাজি হলেন। যারা সমবেত হয়েছিল, তারাও মহা উৎসাহে হাঁকোয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

পূব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে দোলায়িত পর্বত প্রাচীর এবং তারই প্রায় সমান্তরাল রেখায় রাজপথ করেছে তার সহগমন। আমাদের যেখানে গন্তব্য স্থান, সেখানে পূবের পর্বতশ্রেণী নত হয়ে এসে আবাব উপরে উঠে গেছে পশ্চিমে। পাহাড়ের গায়ে নীচের দিকে শাল ও মহুয়ার এক একটা গাছ ছাড়া সবই প্রায় ছোট ঝোপ। উপরে ঘন শালের বন। আমাদের গন্তব্যস্থানে একটি মাত্র মাচা বাঁধবার যোগ্য শাল গাছ, তাতে মাচা বাঁধা হয়েছে এবং তার প্রায় আশি গজ দূরে আরেকটি বড় পাথরের সামনে কয়েকটি সদ্য কেটে আনা শালের ডাল ঠেসান দিয়ে রেখে একটু অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। মিস্টার কুটসের কথামত লটারি করা হল, তাতে আমার ভাগ্যে স্থান পড়ল কাটা শালের ডালের অন্তরাল। হাঁকোয়া সবে শুরু হবে, এমন সময় কয়েকজন এসে বললে, "বাবু হাঁকোয়া কি করব? চিতা নয়, বড় বাঘ। আজ একই সঙ্গে ছ'টি বলিষ্ঠ মহিষ মেরে ফেলেছে।" বললাম যে, দেখলাম চিতার নখের চিহ্ন, বড় বাঘ কি রকম? জবাব এলো "সে আলাদা, আপনি চলে আসার পর ছ'টি মহিষ মেরেছে।"

শিকার বাঘের মজ্জাগত। সব সময় যে বাঘ তার অভাব মোচনের জন্য প্রাণী হত্যা করে তা নয়, সেটা তার খেলা, তার বিলাস। গতিশীল কিছু দেখলেই তার সখ জাগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার। এক পাল গরু-মহিষ চরছে হয়তো, ঝাঁপিয়ে পড়ল একটার উপর,

অন্যগুলি প্রাণ ভয়ে যে যেদিক পারল দৌড়ল, দেখে তার কৌতুক আরো বেড়ে যায়, পর পর ছুটাছুটি করে আরো যে কটিকে পারে মারে। এই তার স্বভাব। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পালামৌ জঙ্গলে বড় বাঘ মারবার অধিকার তখন একমাত্র ইম্পীরিয়াল সার্ভিসওলাদের। স্থানীয় জমিদারেরা তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে শিকার করাতেন; আমার মত ছোট হাকিমদের এলাকার বাইরে বাঘ শিকার। সে কথা অবশ্য গ্রামবাসীদের জানা ছিল না, তাদের জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হল চিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, অত বড় বাঘের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত হবে কি? আত্মসম্মান সগর্বে মাথা তুলল, হলই বা বড় বাঘ, তাতেই বা কি? দ্বিতীয়তঃ, যে বাঘ গরু-মহিষ মেরে এত ক্ষতি করছে, প্রজার এত ভীতি উৎপাদন করছে, তাকে মারা অন্যায়? কখনই না। বললাম, "হ্যাঁ, হাঁকোয়া কর।"

বর্ষ শেষের তপ্ত এলোমেলো হাওয়া দোলা দেয় অরণ্যের শাখায় শাখায়, ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ে জীর্ণ শুকনো পাতা পুরাতন বছরের সঙ্গী, স্তরে স্তরে বিছিয়ে দেয় ঝরা-পাতার আস্তরণ নবীনের আসার পথে। দোল-পূর্ণিমার দিন বা তার কিছু পরে এ অঞ্চলের অরণ্য-বাসীরা তাতে লাগিয়ে দেয় আগুন। ক্রমে দিনের পর দিন সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বন থেকে বনান্তরে। রাতের আঁধারে মনে হয় আলোর মালায় সজ্জিত পাহাড় ও বনভূমি। এমনি করে জ্বলতে থাকে আগুন প্রায় একমাস পর্যন্ত। পাতা, ঘাস, ঝোপ হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন তার লেলিহান শিখার তাপে, নতুন পাতা মুষড়ে ঝরে পড়ে; তাও পুড়ে হয়ে যায় ছাই। অবশেষে বর্ষার শান্তিবারি শিঞ্চনে নিভে যায় সে আগুন। কত সময় দেখেছি, এ সময় শিকার করা বাঘ বা ভাল্লুকের পায়ের তলায় বড় বড় ফোস্কা। এই আগুন লাগানর কারণের জবাবদিহি হিসাবে গ্রামের লোকেরা অজুহাত দেয় যে, এই সময় মহুয়ার ফুল তলায় ঝরে পড়ে, পাতার উপর পড়লে খোঁজা অসুবিধা, তাই সব পুড়িয়ে তলাটা পরিষ্কার করে নেয়। আমাদের দেশকে

বলা হয় দরিদ্র দেশ, কিন্তু দারিদ্র্যের চরম দেখেছি পালামৌর অরণ্যের গভীরে, জানি না পৃথিবীর অন্য কোথাও এর তুলনা আছে কিনা। এই অরণ্যচারী মানুষ সভ্যজগত থেকে বহুদূরে বনের গহনে বাস করে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার তাদেব প্রতিবেশী, তাদের রীতিনীতি এরা বোঝে, জানে তাদের স্বভাবের ধারা, কিন্তু সভ্যজগতের মানুষকে এদের বড় ভয়, বড় সন্দেহ। বনজাত ফল, ফুল, মূল খেয়েই এবা বেশির ভাগ জীবনধারণ করে প্রকৃতিব সঙ্গে সংগ্রাম করে। পুরুষেরা পরে কৌপান, নারীরা সামান্যতম আবরণে কবে লজ্জা নিবারণ। স্ট্যাটিসৃটিক্‌স নিয়ে দেখা গেছে সাধারণত এদের এক পরিবারের সব গৃহ সামগ্রী একত্রিত করলে পাঁচ আনা এক পয়সার বেশি মুল্য হবে না। একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম এদেরই একজনকে, কবে শেষ ভাত খেয়েছে। জবাব পেযেছিলাম, পনেরো বছর আগে এক বিয়ের নিমন্ত্রণে। শস্যের মধ্যে ভুট্টাই এদেব প্রধান খাদ্য।

যাই হোক, হৈ হৈ করে ঢাক-ঢোল শিঙ্গা নাকাড়া বাজিয়ে দলবদ্ধভাবে গ্রামবাসীরা বন্য-জন্তু তাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদেব অভিমুখে পাহাড়ের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে। যেখানে. বসেছি তার পিছন দিকে একটি পাহাড়েব চূড়া উঠে গেছে। সামনের পাহাড়ের ঢালু গায়ে মহুয়া বা শালের গাছতলার আগুন বর্ষায় নিভে গিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। একটা পায়ে চলা পথরেখা ওপারের পাহাড় থেকে নেমে এসে আমাব সামনে ঘুবে পাস দিয়ে পিছনের পাহাড়ে উঠে গেছে। আমার ও মিস্টার কুটসেব পাশে ইংরেজী অক্ষর ভি'র (V) মত গাছেব ডালে কিছুদূব অন্তর অন্তর কয়েকজন করে লোক বসেছে। এদের বলে স্টপ্, হিন্দীতে 'রুক'। এদের কাজ হচ্ছে, এদের কারুর কাছে যখন বাঘ আসে তখন হয় হাততালি দিয়ে বা গাছের ডালে কুড়াল দিয়ে আঘাত ক'রে শব্দ করে, যাতে ভয় বা সন্দেহের কারণ আছে মনে করে বাঘ সে দিক থেকে ঘুরে আমাদের দিকে আসে। কিছুক্ষণ হাঁকোয়ার পরই

আমার অনতিদূরে একজন এমনি শব্দ করতেই ধাঁউ করে এক গর্জন শুনলাম, বুঝলাম বড় বাঘ। একটু পরেই দেখি প্রকাণ্ড বাঘ পায়ে চলা পথ বেয়ে তুলকি চালে নেমে আসছে আমার দিকে সোজা। আমার কাছ থেকে যখন পঁচিশ-ছাব্বিশ ফুট দূরে, প্রায় আমার সমোচ্চ রেখায়, তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম। গর্জন করে লাফিয়ে উঠল সে যেন মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, তারপরই ক্ষিপ্রগতিতে কুটসের পাশ দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিৎকার করে বলে দিলাম, বাঘ "ঘায়েল" সব সাবধান। পাথর থেকে নেমে যেখানে বাঘকে গুলি করেছিলাম সেখানে গেলাম, দেখলাম চারিদিকে রক্ত ছিটকে পড়েছে, আর রয়েছে একটুকরো পাত্‌লা হাড়। কোথায় লাগল, মারলাম মাথা লক্ষ্য করে, এ হাড় কিসের ? কুটসকে জিজ্ঞাসা করলাম, মারলে না কেন তোমার সামনে যখন গেল, প্রত্যুত্তরে বলল, "হ্যাঁ, জখম বাঘকে মারতে গিয়ে প্রাণ হারাই।" স্থানীয় জমিদারবাবু গরুড় দেও সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র রামনাথ সাহসী যুবক। এগিয়ে এসে বলল, "চলুন না হুজুর ওর খোঁজে যাই।" গুলি ওর লেগেছেই, কিন্তু সেদিন তার পিছনে ধাওয়া করা সমীচীন মনে করলাম না। একে, প্রথা বিরুদ্ধভাবে শিকার করতে গেছি, তায় বাঘ জখম হয়ে গেল। জখম বাঘ সাক্ষাৎ যমতুল্য, যদি কাউকে মেরে ফেলে, এই সব নানা চিন্তায় বিমষ মনে, সব শিকারীদের আগে বন থেকে বের করে ফিরে এলাম।

পর দিন রমানাথ এসে বলল, রক্তের বিন্দুতে গতিপথ চিহ্নিত করে ক্ষেত পার হয়ে ঘায়েল বাঘ পাশের পাহাড়ের শালবনে আশ্রয় নিয়েছে। গুলি তার এমন জায়গায় লেগেছে, যেখানে সে চাটতে পারে না, তাই বালিতে লুটোপুটি করেছে—তার চিহ্ন বর্তমান। যে পাহাড়ে সে গেছে সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে স্থান ভ্রষ্ট হয়ে মস্ত পাথর একটি গড়িয়ে নামার পথে যেন থমকে থেমে গেছে পাহাড়ের মাথায় এবং তারই গায়ে এসে হেলে পড়েছে আরও বড় বড় তিন চারটি প্রস্তরখণ্ড এবং কয়েকটিতে মিলে একটি ছোট গুহার মত রচনা

করেছে। তারই অন্ধকারেমাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছে সে, যত দিন ঘা না সারে বা মৃত্যু এসে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, সে ওখান থেকে নড়বে না। দুঃখের দিনে মানুষ যেমন খোঁজে তার গৃহকোণ, জন্তু জানোয়ারেরাও তেমনি খোঁজে তাদের পরিচিত নিরাপদ স্থান।

মিঃ কুটসকে বললাম, চল ওর খোঁজে যাই। তিনি বললেন, দেখো আমি সূর্যাস্ত আইন (Sunset law) মানি। যেদিন বাঘকে গুলি কবেছ সেদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত যেই মারুক বাঘ তোমার, কিন্তু যদি আজ আমি মারি তাহলে বাঘ কার? বললাম, "সে মীমাংসা পবে হবে, আগে গ্রামবাসীদের বিপদেব কারণ ওকে তো শেষ করা যাক, তুমিই না হয় নিয়ো।" তখনই উভয়ের সম্মতিক্রমে স্টেটস্‌ম্যান কাগজে লিখে পাঠালাম, কার বাঘ? (Whose tiger?) সব অবস্থা জানিয়ে নীচে নাম স্বাক্ষরের পরিবর্তে দেওয়া হল 'পালামৌর শিকারী'। কুটস সাহেব রাজি হলেন। এখানে বলে রাখি অনেক দিন পর্যন্ত এই নিয়ে নানা মতামত প্রকাশিত হল এবং শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল, প্রথম গুলি যার, বাঘ তারই।

যে পাহাড়ে বাঘ, সে পাহাড় ও পাশের পাহাড়ের তরঙ্গের মাঝ দিয়ে উটারী-নগরেব পথ চলে গেছে বেঁকে। প্রায় এক হাজার গ্রামবাসী তাদের সব বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পাহাড়টিকে ঘিরে হাঁকোয়া করতে করতে উপরে উঠে যাবে, ঠিক হল। বাঘের আশ্রয়ের উল্টাদিকে যে পথে তার বেরিয়ে আসবার কথা, সেখানে শালবনের ধারে পাহাড়ের গায়ে অপ্রশস্ত একটু সমতল স্থানে দেখা গেল। এবারও মাত্র একটি মাচা এবং এবারও লটারি করে সেটি পড়ল কুটসেব ভাগ্যে। কাছেই একটি বড় কোমর সমান উঁচু প্রস্তরখণ্ডের উপর বসলাম।

দূর থেকে শুনছি রামশিঙ্গার বিচিত্র সুর, ঢাক-ঢোলের শব্দের সঙ্গে হাঁকোয়ার কোলাহল। ক্রমে শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে এলো, হাঁকোয়ারা প্রায় পাহাড়ের চূড়ায় এসে গেছে। হঠাৎ দেখি, গুহার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো আহত বনরাজ, হাল্কা বাদামী রঙের

উপর কালো ডোরা পরিষ্কার দৃশ্যমান, মুখ ঈষৎ ঘোলা এবং মুখের চারপাশটায় কালো রেখা দেখা যায় এবং তার যৌবনদন্ত দুটি, লম্বা লেজটি পিছনে অর্ধচক্রাকারে অবনমিত, পিছনের বাঁ-পা টেনে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। গুহার আশ্রয় ছেড়ে কয়েক-পা এগিয়ে এসে আবার ফিরে গেল গুহার দিকে, আবার বেরিয়ে এলো, যেন ঠিক স্থির করতে পারছে না গুহার আশ্রয়ই নিরাপদ না সে আশ্রয় ত্যাগ করে পালানই শ্রেয়। শেষ পর্যন্ত কুটসের মাচার দিকে ঘুরে গেল। পাশে বন্দুক নামিয়ে রেখে ঘুরে বসে অপেক্ষা করে আছি ঐ বন্দুকের শব্দ হয় এই আশায় উৎকণ্ঠ হয়ে, কিন্তু কোন সাড়াই নেই। পিছন ফিরতেই দেখি, সামনে আমার থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে বাঘ গুহার দিকে ফিরে চলেছে। কুটসের সামনে দিয়ে গভীর খাদ বেয়ে আমার অলক্ষ্যে নেমে অনতিদূরে এসে গেছে, তাড়াতাড়ি বন্দুক আমার পুরানো বন্ধু Jeffrey's Cordite ·3?0 bore তুলে নিলাম এবং গুলি করলাম। বিকট গর্জন করে সে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে পড়ে গেল এবং পরক্ষণেই সেই পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে গেল, দ্বিতীয়বার আমার বন্দুক অগ্নি উদ্গীরণ করল, দেখলাম গুলি লাগল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সোজা উঠে পাথর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিৎকার করে বললাম, "বাঘ ফিরে যাচ্ছে, যে যেখানে পার পালাও।" হাঁকোয়ার অত কোলাহল মুহূর্তে থেমে যাওয়াতে বনের স্তব্ধতা দ্বিগুণিত হয়ে অনুভূত হল। অত্যন্ত বিরক্ত কুটস বললেন, "তুমি আজকের শিকার নষ্ট করলে। ও যেত কোথায়? কাছে আসতই। তখন মারতাম, সব পণ্ড করলে।" বলে দ্বিরুক্তি না করে ফিরে চলে গেলেন। আজও বিফল হব? কখনই না। মৃত্যুপণ করে স্থির করলাম আজ এর শেষ করবই, হয় আহত বাঘকে শেষ করব, নয় জীবন দিতে হয় দেব। বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লাম তার সন্ধানে। সঙ্গে চলল অসীম সাহসী রামনাথ। একটি ক্ষিপ্রগতি তরুণ চলল সঙ্গে, যে আমাদের সঙ্কেতে গাছে উঠে চারিদিক দেখে ইসারায় জানায়, বাঘ দৃষ্টি সীমার ভিতরে

আছে কিনা এবং আবার নেমে আসে। এমনি করে যে-পথে বাঘ অদৃশ্য হয়েছে সেই পথে চলেছি। চার-পাঁচবার কোনও হদিস না পাবার পর দেখি সামনে একটি বড় পাথর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, তারই গায়ে একটি ক্ষণভঙ্গুর গল্‌গল্‌ গাছ—তাতে উঠেছে তরুণটি। উপরে উঠেই দ্রুত মাথা নীচু করে দেখালো, পাথরের ওপাশে বাঘ শুয়ে। বন্দুক নিয়ে সজাগ হয়ে তার হাতে তুলে দিলাম একটি পাথরের টুকরো ওর গায়ে ফেলতে। ফেলেই মাথা নীচু করল যাতে দৃষ্টিগোচর না হয়, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। আবার দিলাম আরেকটি টুকরো, এতেও কোন সাড়া নেই, তখন লাফিয়ে উঠে পড়লাম পাথরটির উপরে। পার হয়ে দেখি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বাঘ, দশ ফুট আড়াই ইঞ্চি লম্বা, চিরনিদ্রায় অভিভূত। আমার দুই গুলিই বিদ্ধ করেছে তাকে। সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠল। মহা উৎসাহে ছোট শালগাছ কেটে মই-এর মতন তৈরি করে তার উপর রেখে ষোল জন মিলে বহন করে নিয়ে গেল তার দেহ। পরে দেখা গেল প্রথমদিনের মাথা লক্ষ্য করা গুলি তার বাঁ কানের পিছনের চামড়া ভেদ করে বাঁ পায়ের থাবায় লেগেছিল।

ছয়

বন্ধু ইয়াকুব খান

উৎসব যেমন একলার নয়, আনন্দের অংশে তাতে আছে সকলেরই সমান অধিকার, শিকারেও তেমনি। শিকারের আনন্দ শুধু মাত্র শিকারীর নয়, যাঁরা এতে সঙ্গী হন বা যে-কোনওভাবে যোগ দেন, শিকার তাঁদের সকলেরই। পৌরাণিক যুগে শিকারকে অষ্টাদশ ব্যসনের মধ্যে এক ব্যসন বলে গণ্য করা হত। আধুনিক যুগে অবশ্য একে বলা হয় স্পোর্ট বা খেলা। খেলার মাঠে যারা খেলোয়াড়, হার-জিত তাদের তো আছেই, কিন্তু খেলার উত্তেজনাই মুখ্য। দর্শকদের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়, হার-জিতের আনন্দ বা নিরাশা যেন একান্ত তাদেরই। শিকারের কতকগুলি লিখিত এবং অলিখিত নিয়ম আছে। মেয়ে বাইসন, মেয়ে হরিণ বা হরিণ শিশু অবধ্য। বছরের যে-যে সময় পশু পাখীর নীড়রচনা বা সন্তানসম্ভাবনার সময় সে সময়েও শিকার নিষিদ্ধ। সংরক্ষিত বনে শিকার আইন-বিরুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া যে সত্যিকারের শিকারী তার পালনীয় কতকগুলি নিয়ম আছে যা অলিখিত এবং তা পালন করবার ভার তার নিজের উপরে ন্যস্ত থাকে। যেমন, আহত জন্তুকে তিলে তিলে মরতে না দিয়ে তাকে খুঁজে বা'র করে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে হয়, থাক না তাতে নিজের প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা। একই সঙ্গে দুজনে গুলি করবে না, অপরকে সুযোগ দিয়ে তারপর নিজে। প্রথম গুলি যার লাগে শিকার তারই, যদি জন্তু পরে অপরের গুলিতে প্রাণ হারায় তাহলেও।

১৯২৬ সালের বর্ষাশেষে একদিন সবে মফঃস্বলের কাজ থেকে হাজারিবাগে বাড়ি ফিরছি, গাড়ি থেকে নামতেই দেখি সূর্য সিং দাঁড়িয়ে। সূর্য সিং ডেপুটি কমিশনারের আরদালী, জাতে রাজপুত, ভদ্রসন্তান। এগিয়ে এসে বলল, বাঘে তার গরু মেরে গেছে

সেদিনই। হাজারিবাগ থেকে চাত্রার পথে শহর থেকে আট মাইল দূরে তাদের গ্রাম, তারই উপকণ্ঠে ঘটে গেছে ঘটনাটি। খোলা জায়গা থেকে বাঘ কোনও ফাঁকে এসে তার শিকার না নিয়ে পালায়, এ জন্য পাহারায় লোক রেখে সে ছুটে এসেছে আমার কাছে। দুপুরের সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি আছে। আর দেরি না করে তখনই বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে চলল আমার ভাগিনেয় শচীকান্ত—শিকারের আশায় উদ্‌গ্রীব।

উচু নীচু তরঙ্গায়িত ভূমি ও শালবনের ভিতর দিয়ে হাজারিবাগ থেকে চাত্রার দিকে যে রাজপথ চলে গেছে, তা থেকে আধ মাইল দূরে ছ-সাত ঘর ভুঁইয়া বসতি নিয়ে ছোট গ্রামখানি, নাম সিমেরিয়া। ছোট ছোট মাটির কুঁড়েগুলির পাশেই সরু ডাল-পালার বেড়া, শিমের লতায় ছেয়ে আছে। দুপাশের বেড়ার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে ঢালু বনের দিকে গ্রাম্য পথ নেমে গেছে। গ্রামের সংলগ্ন, বর্ষাশেষের সবুজ কয়েকটি ক্ষেত ধাপে ধাপে নেমে গেছে, নীচের দিকে। ক্ষেত-গুলির শেষেই শুরু হয়েছে পুটুসের বন, করমচার ঝোপ, ভেলার বড় বড় পাতাওলা গাছ, বড় কাটা শালের গোড়া থেকে বেরুনো পাৎলা পাৎলা শাল গাছ। বর্ষার জলধারা গ্রাম ধুয়ে সরু সরু খোয়াইয়ের পথ বেয়ে নালা হয়ে বয়ে চলে গেছে বনের ভিতরে। গ্রাম থেকে দু-শ' গজ দূরে নালাটির ধারে পড়ে রয়েছে মরা গরুটি, আর তারই পূবে নালার উপর প্রায় হেলে পড়া ছোট একটি ডুমুর গাছ, যার তলা পুটুসের ঝোপে ঘনভাবে ঢাকা। এই অনুচ্চ ডুমুর গাছটি ছাড়া কাছে-পিঠে কোথাও না আছে কোন গাছ, না কোন আত্মগোপন করবার মত বড় ঝোপ। পশ্চিমের আকাশে তখন পড়ন্ত রোদ, আমরা ডুমুর গাছে উঠলে পশ্চিমের আলো আমাদের করে তোলে প্রকট, কিন্তু বাঘের দিকে নিশানা করবার সময় আমাদের লক্ষ্য পড়ে আলোর দিকে সোজা। কিন্তু তখন কোন চিন্তা করবার সময়ও নাই এবং অন্য কোনও উপায়ও নাই দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম সেই ডুমুর

গাছে। একটা দো-ডালাকে আশ্রয় করে বসা গেল। আমি গাছে উঠতেই শচীর সঙ্গে গ্রামের যারা এসেছিল তারা চলে গেল।

গ্রামে তারা পৌঁছয়নি এমন সময় দেখি বাঘ আসছে। সন্ধ্যার ক্রমবিলীয়মান আলো তখনও আঁধারে মগ্ন হয়ে যায়নি, চারিদিক হয়ে এসেছে অস্ফুট আবছা, এরা যাকে বলে 'ঝোলকোল'। সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তাব দু-পায়ের নরম সাদা রোঁয়া, হলদে কালো ডোরা অন্ধকারে মিশে গেছে। স্বভাবতঃ বাঘ খোলা জায়গায় বসে তার শিকার খায় না ; তাকে দ্রুতবেগে নিয়ে বনের মধ্যে কোন নিরাপদ স্থানে, যেখানে সহজে দৃষ্টি চলে না, সেখানে বসে ইচ্ছামত খায়। বাঘ এসে দাঁড়াতেই তাকে অবকাশ না দিয়ে আমি তুলে নিলাম বন্দুক এবং গুলি করলাম। সে বিকট গর্জন করে লাফিয়ে উঠল, এবং মাটিতে গোল হয়ে পায়ের কাছে মাথা এনে তালগোল পাকিয়ে গড়াগড়ি

করে পড়ল জলে, ঠিক আমাদের নীচে। পুটুসের ঝোপে কিছুই দেখা যায় না, তার পরই অদৃশ্য। বনে বনে কেঁপে উঠলো তার গর্জনের রেশ। চিৎকার করে গ্রামবাসীরা জানতে চাইল ফলাফল। বললাম, বাঘ জখম হয়েছে, সাবধান! অন্ধকারে তখন করার কিছুই নাই, তাই ফিরে এলাম। পরদিন আলো হবার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম সেখানে। বাঘকে যেখানে গুলি করেছিলাম সেখানে গিয়ে দেখি অনেকটা রক্তের দাগ, গুলি তাকে বিদ্ধ করেছে। নালা পার হয়ে ওপারে দেখি ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ এবং তার পায়ের চিহ্ন। দেখে বুঝলাম গুলি তার একটা পা জখম করেছে। স্থির করলাম তাকে খুঁজে বার করে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাবো।

কোথাও বা শুকনা পাতার উপর, কোথাও বা ঘাসের উপর রক্তের দাগ অনুসরণ করে চললাম তার খোঁজে। একটু দূরে গিয়েই দেখি, ওপারের অসমতল পার্বত্য প্রদেশ বন্য শিউলির বনে ভরা। যাঁরা বন্য শিউলি দেখেছেন তাঁরা জানেন যে গাছগুলি সাত আট ফুটের বেশি উঁচু হয় না এবং ঘন ডালপালায় ছাওয়া ঝোপের মত হয়। বর্ষার পত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ, আসন্ন শরতের আগমন সূচনা করছে দু চারটি ঝরা ফুলের মৃদু গন্ধ। এই শিউলি বনের ভিতরে দৃষ্টি চলে না। ঘায়েল বাঘ সাক্ষাৎ কালান্তক, সে যে কোথায় বসে আছে দেখবার উপায় নাই. অথচ এই বনব্যূহের অন্তরাল থেকে সে আমাদের সব গতি লক্ষ্য করছে এবং কোন্ মুহূর্তে যে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কোনই স্থিরতা নাই। অতি সাবধানে তাই বসে বসে গুড়ি মেরে অগ্রসর হতে লাগলাম আমরা বাঘের রক্তবিন্দুর চিহ্ন অনুসরণ করে। জমির নিম্নমুখী গতি দেখে বুঝলাম, কাছেই কোথাও নদী আছে। সঙ্গে সূর্য সিং ও দুঃসাহসী দু-একজন যারা ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। শিউলি বন এড়িয়ে একটা ঘোরা পথে সোজা নেমে গেলাম সেই পার্বত্য নদীটিতে। ক্ষীণ পার্বত্য নদী, বর্ষার জলধারা এনে দিয়েছে তার ধমনীতে প্রাণের

প্রবাহ। অনুসন্ধান করতে লাগলাম পদচিহ্নের—বাঘ নদী পার হয়ে গেছে কিনা। একটু দূরে গিয়েই দেখি এক জায়গায় নদীর জল তখনও ঘোলা হয়ে রয়েছে এবং ওপারেই তার পায়ের আবার দাগ এবং তাজা রক্তের চিহ্ন। বুঝলাম, সে আমাদের আসার একটু আগেই নদী পার হয়ে গেছে, তারই চলায় ঘুলিয়ে ওঠা নদীর লাল মাটি তখনও থিতিয়ে বসবার অবসর পায়নি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ন'টা। সেদিন বেলা এগারটার সময়ে রাঁচিতে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবার কথা, বিশেষ জরুরী কাজে। উপরন্তু পালামৌ-ডাল্টনগঞ্জে যেতেই হবে, কাজেই একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে ফিরে যেতেই হল, অনন্যোপায় হয়ে। চারপাশের গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে দিলাম বাঘ 'ঘাহিল', তারা যেন গরু মহিষ চরাতে বা কাঠকুটো সংগ্রহ করতে বনে না যায়। আমি পরের দিন ফিরেই আবার আসব।

দুদিন পরে মনের দুর্দমনীয় আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে ফিরে এলাম। যাবার দিন বন্ধু ইয়াকুব খাঁকে শিকারের বার্তা পাঠিয়ে গিয়েছিলাম, বলেছিলাম তিনি যেন সিমেরিয়ার আগের পথের বাঁকে সুলতানা গ্রামের সীমানায় অপেক্ষা করেন। হাজারিবাগ থেকে ছ-মাইল দূরে ক্ষুদ্র গ্রাম হেদলাগের তিনি জমিদার। স্বল্পভাষী, উদারচেতা, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজারই তিনি শ্রদ্ধার্হ। গ্রামের কোথাও কোনো মতবিরোধ হলে তাঁর কাছে আসে মীমাংসার জন্য। ১৯১১ থেকে আজ পর্যন্ত ইনি আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্। শিকারের সখ এঁর প্রচণ্ড। ইনি সেই জাতের শিকারী যাঁরা গুলি বৃথা অপচয় করেন না। যেখানে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছোঁড়েন সেখানে অব্যর্থ এবং যত বড় ভয়াবহ পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হতে হোক, সঙ্গীকে ফেলে পিছন ফেরেন না। যাই হোক, শচীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম আহত ব্যাঘ্রের সন্ধানে, এবং দেখলাম ঠিক সময়েই খাঁ সাহেব পথের ধারে অপেক্ষা করে আছেন।

আমরা তিনজন চলেছি বনের ভিতরে। আমার হাতে এক্সপ্রেস ৫০০ রাইফেল, খাঁ সাহেব ও শচীর সঙ্গি ১২-বোর দোনলা বন্দুক। আমার সঙ্গে চলেছে সূর্য সিং ও দুটি বৃক্ষারোহণপটু যুবক। আগের দিন যেখান থেকে ফিরে গেছি সেখানে গিয়ে ভেবে দেখলাম, বাঘের গুলি যদি এমন জায়গায় লেগে থাকে যেখানে সে চাটতে পারে না, তাহলে সে বেছে নেবে অন্ধকার গর্ত, মাছির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য। মাংসভোজী জীবেদের রক্ত সহজে বন্ধ হয় না, শাক বা তৃণভোজীদের সহজে হয়। কিন্তু তার পদচিহ্ন দেখে বুঝলাম যে, সে নদী পারের শালবনে ঢুকেছে। ভিজে মাটিতে যেখানে তাব চার পায়ের দাগ পড়েছে সেখানে দেখলাম যে, সামনের ডান পায়ের ছাপ হাল্কা—তার মানে জখম ওই পায়ে, তাই ভব সয় না। অন্য পায়ের তুলনায় তাই এ-পা চালনা করবে কম এবং স্বভাবতঃ গতি হবে দক্ষিণাবর্তে। দক্ষিণে চেয়ে দেখি অজস্র খোয়াইয়েব বলিরেখা ও ঘন শালেব বন। খোয়াইয়ের গায়ে ছিটানো অভ্রের কুঁচিগুলি সকালের আলোয় ঝিকমিক করছে। বাঘ তাহলে নিশ্চয়ই শালবনের গহনে আশ্রয় নিয়েছে অনুমান কবলাম। যুবক দুটি এক-একটি গাছের উপব উঠে যতদূব দৃষ্টি যায় দেখে, বাঘের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় কিনা এবং সেই অনুসারে আমবা আবার অগ্রসর হই। হঠাৎ একজায়গায় দেখি ঝরা পাতার উপর এক ফোঁটা তরল রক্ত, একটু আগে সে যে সেখানে ছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারই আশেপাশে খুঁজতে চোখে পড়ল তার বসার দাগ, সেখানে সে 'মাটি নিয়েছিল' এবং পাতাব উপরে শুয়েছিল। শালবনের ওপারে একটি ছোট কচ্ছপাকৃতি টিলা শালবনে ছাওয়া, মনে হল সেখানে ঢুকেছে। অদূরে শিকারী গ্রামবাসী যারা অনুসরণ করছিল তাদেব ডেকে বললাম, ছোট টিলা বা পাহাড়টি ঘিরে ফেল এবং হৈ হৈ করে হাঁকোয়া কর। বন্দুকের শব্দ পেলেই যে যেখানে পারবে গাছে উঠে পড়বে, আমাদের সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত নামবে না। ইতিমধ্যে আমরা

সংক্ষিপ্ত পথে পাহাড়ের পশ্চিমে নেমে গেলাম, যেখানে জঙ্গল অন্যদিক ক্ষীণ হয়ে কিছু পরিষ্কার জায়গার সৃষ্টি করেছে, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করে মাটিতে দাঁড়ালাম। খাঁ সাহেব ও শচীকে বলে দিলাম, বন পার হয়ে খোলা জায়গায় না বেরুনো পর্যন্ত বাঘকে যেন গুলি না করা হয়, কারণ একে তো ঘায়েল বাঘ, অসম্ভব হিংস্র, তারপর সে যদি না মরে, ফিরে যায়, সমানে হাঁকোয়া করছে যারা তাদের যাকে পাবে মেরে বেরিয়ে যাবে, কোন বাধা মানবে না। শিকারীর নিজের প্রাণ ছাড়া যারা সঙ্গে আসে সকলেরই প্রাণের দায়িত্ব তার।

বনের সোজা মুখো-মুখি দাড়ালাম আমি। আমার দুই পাশে কিছু দূরে খাঁ সাহেব ও শচী। হাঁকোয়া শুরু হয়েছে, আমরাও প্রস্তুত। কিছু পরে দেখি বন থেকে বেরিয়ে এলো বাঘ। নধর প্রকাণ্ড পুষ্ট দেহ, রোদ পড়ে চক্‌চক করছে তার মসৃণ গা। সামনের ডান পা আমার প্রথম দিনের গুলিতে একেবারে ভেঙ্গে গেছে এবং রক্ত ঝরছে, রক্তক্ষরণে কিছু দুর্বলও হয়েছে, তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা চলে আসছে আমার দিকে, চোখে তার হিংসার আগুন। ঘায়েল বাঘকে মারবার সময় যথাসম্ভব কাছ থেকে মারা উচিত, কারণ নিশানা করবার সময়ে কাছে যদি লক্ষ্যের তফাৎ হয় ইঞ্চির ভগ্নাংশ, দূরে সেই তফাৎই হয়ে দাঁড়ায় কয়েক ইঞ্চি। গুলি যদি কোন রকমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহলে হিংস্র বাঘ ফিরে গিয়ে হাঁকোয়াদের উপর মৃত্যু হেনে চলে যায়। আমি তাই স্থির প্রতীক্ষায় আছি যে, আরো কাছে আসুক। তার ওই হিংস্র মূর্তিতে আমার দিকে এগিয়ে যাওয়া দেখে খাঁ সাহেব আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না, তাঁর দোনলা বন্দুক গর্জন করে উঠল। পড়ে গেল বাঘ এবং সগর্জনে ঝটাপটি করতে লাগল। দেখলাম মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী, আরও গুলি করে চামড়া নষ্ট করা বৃথা। কাছে এগিয়ে গেলাম, ক্রমে তার ছটফটানি এলো থেমে, প্রতিহিংসাপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কিন্তু সে তখন

অশক্ত। ক্রমে তার চোখ এলো বুঁজে, চিরনিদ্রায় হল তার যন্ত্রণার অবসান।

যার ভয়ে গ্রামসুদ্ধ লোক এতদিন তটস্থ ছিল, আজ তার সব উপদ্রব, সব হিংস্রতার শেষ জেনে গ্রামবাসীরা এসে ঘিরে দাঁড়াল তার বিশাল মৃতদেহকে।

সাত

স্যর এডোয়ার্ড গেট

১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৮ সালের শেষ পর্যন্ত সেট্‌লমেণ্টে থাকার সময় পালামৌর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অনেক ঘুরলাম। এই সময় পালামৌর রহস্যময় বনকে এবং তার আশ্রিত পশু-পাখীদের, তার ক্রোড়ে পালিত অরণ্যবাসী মানুষকে ভাল করে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেলাম। শিকার ও জন্তু-জানোয়ারের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। আমার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছিল যে সব স্থানীয় অরণ্যবাসী গুরুরা তাদের উদ্দেশ্যে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

১৯১৮ সালে খাসমহলের কাজে নির্বাচিত হয়ে পালামৌতে বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দলাল সিংহের কাছ থেকে কার্যভার নিলাম। ছাত্র জীবনে আমরা ছিলাম সমসাময়িক, যদিও আমরা বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছাত্র। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের এবং নন্দবাবু স্কটিশ চার্চ কলেজের। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী, বিশ্ববিদ্যালয়ের দেদীপ্যমান ছাত্র এবং ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনেও চিরদিন মা সরস্বতীর সেবা করে গেছেন এবং তাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। এ ছাড়া তিনি পরম বৈষ্ণব। আমি যে-সময় পালামৌ খাসমহলের কাজে যাই তার মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে বড়দিনের ছুটি যাপনের প্রমোদ হিসাবে পালামৌর জঙ্গলে প্রাদেশিক গভর্নরের শিকারের প্রচলন হয়। জঙ্গল প্রায় সবই খাসমহলের আয়ত্তে, কিন্তু খাসমহল অফিসার নন্দবাবুর শিকারের নেশা বা কোন সখই ছিল না, তাই শিকারেরযা কিছু বন্দোবস্তর ভার পড়ে এস-পির উপর, ইনস্পেক্টর মৌলবী ওজিউদ্দীনের মাধ্যমে। গভর্নরের শিকার-ক্যাম্পের অন্যান্য যা ব্যবস্থা এবং রসদ ইত্যাদি সংগ্রহের ভার অবশ্য খাসমহলের ছিল।

সে বছর বড়দিনে স্থির হল পালামৌর কেড়ের জঙ্গলে শিকারের আয়োজন হবে। এই আয়োজন করারও পদ্ধতি ছিল। জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে যারা শিকারী এবং জন্তু জানোয়ারের ভাবধারা, রীতিনীতি জানে, তারা আগে সংবাদ সংগ্রহ করতো কোথায় কোথায় কি জানোয়ার আছে, পদচিহ্ন দেখে হিসেব ক'রে সঠিক সংবাদ দিত কোথায় বাঘ আছে, বাঘ না বাঘিনী, সঙ্গে বাচ্চা আছে কিনা, কটা, তারা কোথায় জল খায়, কোন্ পথে আসে যায়, এই অনুসারে শিকারের মাচা তৈরি হত। মাচার চারটি খুঁটির দুটি বা অন্তত একটি খুঁটি হ'ত কোন সজীব গাছ। আট-নয় ফুট মাটি থেকে উচুতে যেখানে গাছের দো-ডালা বেরিয়েছে সেইখানে মাচা প্রস্তুত হত। এদিকে রাজভবন থেকে নামের তালিকা আসতো ক'জন শিকারে আসবেন, কে কে আসবেন এবং মাচার সংখ্যাও সেই অনুসারে তৈরি করে আরো দু-একটি বেশি করা হ'ত। তারপর কদিন ধরেই যেখানে যেখানে মাচা সেখানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহিষ বাঁধা হ'ত। বাঘে মহিষ মারলেই খবর আসতো এবং যেখানে মেরেছে সেখানে শিকারে যাওয়া হ'ত।

যেদিন গভর্নর সদলবলে আসবেন সেইদিনই সকালে খবর পেলাম বেৎলার 'বলাহি কুসুম' জঙ্গলে বাঘে মহিষ মেরেছে। সোজা চলে গেলাম ডাল্টনগঞ্জ স্টেশনে। সকলে এসে পৌঁছেছেন, গবর্নর স্যর এডোয়ার্ড গেট, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি, চীফ সেক্রেটারি, এ-ডি-সি। এস-পি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে উপস্থিত, তাঁদের সম্বর্ধনার জন্য। শিকারের সাজ-সরঞ্জাম বন্দুক, ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে উৎসুক হয়ে সকলে শিকারের সংবাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আমি যেতেই মিঃ কিলবী, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, আমাকে স্যর এডোয়ার্ড গেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার চাকরির মূলেই তিনি, কাজেই পরিচয় আগেই ছিল। যাই হোক, আর পরিচয় হ'ল তাঁর চীফ সেক্রেটারি মিঃ ম্যাকফার্সনের সঙ্গে। বেৎলার জঙ্গলে

মহিষ মারার কথা বলতেই তিনি সহাস্য মুখে প্রশ্ন করলেন, "সে বন তোমার জানা?" বললাম, "মৌলবী ওজিউদ্দিনই প্রথানুসারে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন, তিনিই সংবাদ দিয়েছেন। তবে সমস্ত বন সঠিক না জানলেও শিকারের জায়গা আমার মোটামুটি জানা।" দ্বিতীয় প্রশ্ন, "বাঘ মেয়ে না পুরুষ?" সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করে যাইনি; কাজেই সঠিক বলতে পারলাম না।

আগে আগে পথ দেখিয়ে চললাম আমার মোটর-বাইকে, পিছনে চলল তাঁদের মোটর। যেখান থেকে হাঁটা পথ ধরতে হবে, সেখানে নেমে সকলে চললাম হাঁটা-পথে, একজনের পিছনে একজন—এই রকম সারিবদ্ধভাবে নিঃশব্দে মৌলবী ওজিউদ্দিনকে অনুসরণ করে আমরা চললাম। খুব ঘন জঙ্গল। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় নানারকম গাছ, তারই ভিতর দিয়ে চোখে পড়ার মত কোন পরিবর্তন না ক'রে মাঝে মাঝে পরিষ্কার পথ করা হয়েছে। প্রখর দিবালোকেও ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার। মাচার কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। পর পর সব মাচা, কোনটা বা একটু উচু জায়গায়, কোনটা বা নীচে, যেমন যেমন সুবিধামত জায়গা তেমন তৈরি করা প্রায় একই সারিতে যথাসম্ভব। প্রত্যেকেই সব মাচার স্থিতি দেখে নেয় বসার আগে, যাতে গুলি কোনমতে অন্য মাচায় না লাগে ভুলক্রমেও। প্রত্যেকে নিজের নিজের মাচায় মোড়া ও বন্দুক নিয়ে উঠে গেলেন। সর্বপ্রথম প্রাইভেট সেক্রেটারি, তারপর যথাক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, গভর্নর, এ-ডি-সি, এস্-পি ও চীফ সেক্রেটারি। মাচায় ওঠার আগে মিঃ ম্যাকফার্সন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি তোমার বন্দুক এনেছ?" এনেছি বলাতে তিনি বললেন, "তাহলে পাশের-মাচায় উঠে পড়।" আগেকার যুগে, গভর্নরের শিকারে তাঁর সঙ্গের সাথী এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আমার মত সাধারণ হাকিমের শিকারের রীতিই ছিল না, কাজেই ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "সামনে যদি আমার জানোয়ার আসে আমি কি

মারব ?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো "মারবে বৈকি, নিশ্চয়ই।" দ্বিরুক্তি না করে বন্দুক নিয়ে উঠে পড়লাম মাচায়।

হাঁকোয়া শুরু হয়েছে, বাঘের হাঁকোয়া। নিয়ম হ'ল বাঘের হাঁকোয়াতে বাঘ ছাড়া অন্য জন্তু মারা হবে না। সকলেই আশান্বিত হয়ে বসে, এই বুঝি তারই মাচার সামনে এলো বাঘ। শীতের প্রথমে ঘন চিলবিলের বন তখন গাঢ় কাল্‌চে সবুজ। রাত্রে তুষার পড়েছিল, সকালের উত্তাপে গলে গেছে, কিন্তু ঘাস-পাতায় রয়ে গেছে সিক্ততার আভাস। মাঝে মাঝে শীতের কন্‌কনে হাওয়া জাগিয়ে তুলছে মর্মর ধ্বনি। হাঁকোয়াদের তাড়া খেয়ে প্রথমে দৌড়ে পালাল ক্ষিপ্রগতি যাবা, তারা হরিণ ইত্যাদি—তড়বড় করে মাচার কাছে গিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল, হরিণের দল ত্রস্ত শঙ্কিত হয়ে। তৈবি বন্দুক সামনে রেখে বসে আছি। মিঃ ম্যাকফার্সনের মাচার বাঁ-পাশের মাচা থেকে বন্দুক গর্জন করে উঠল। তার অল্প পরেই মিঃ ম্যাক-ফার্সনের মাচার থেকে গুলিব শব্দ। তারও কিছু পরে দেখি আমার মাচার সামনে একটি বাঘের বাচ্চা, শিশুত্ব ঘুচে প্রায় যৌবন এসেছে। সাত-আট ফুট লম্বা দেহ। মারবো কি মারবো না ইতস্ততঃ করে বন্দুক তুলে গুলি করলাম, বাঘ শুয়ে পড়ল। হাঁকোয়া শেষ হতে মাচা থেকে নেমে মিঃ ম্যাকফার্সনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি মেরেছেন ?" তিনি দেখালেন সামনে পড়ে রয়েছে, তাঁব শিকার, আমি যে বাঘের বাচ্চাটি মেরেছি তারই জোড়া। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা কবলেন, আমি গুলি করলাম কিসে এবং মেরেছি কিনা, উত্তর শুনে খুশি হলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখি এস-পি'র মাচায সামনে পড়ে আমাদের মরা বাচ্চাদের মা, বাঘিনীর মৃতদেহ।

স্থির হল, মধ্যাহ্নভোজনের পরই কেড়ের কাছের অন্য জঙ্গল 'ঝাঁঝ বয়েরে' আবার বাঘের হাঁকোয়া হবে। তাড়াতাড়ি সে বনে গিয়ে অন্য এক দল হাঁকোয়া ঠিক করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরেই এলেন সকলে এবং সকলে যখন মাচায় উঠছেন

তখন মিঃ ম্যাকফার্সন আমায় ডেকে বললেন, "তুমি আসছ না শিকারে?" সকালে তাড়াতাড়িতে আমার বন্দুক ফেলে এসেছিলাম সকালের শিকারের জায়গায়। তাই বললাম যে, "বন্দুক বোধ হয় ফেলে এসেছি।" কিন্তু দেখলাম আমার ভুল হলেও মিঃ ম্যাক-ফার্সনের দৃষ্টি এড়ায় নি, তিনি ঠিক সঙ্গে করে সেটি এনেছেন এবং আমার হাতে দিয়ে বললেন "বসে পড় মাচায়।"

হাঁকোয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এ-ডি-সির মাচা থেকে এক গুলির শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেকে বললেন, বাঘ জখম হয়েছে এবং মাচাগুলির পিছন দিকে পালিয়ে গেছে। সকলে নিজের নিজের মাচায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, আমি মাচা থেকে নেমে গেলাম এবং বললাম, "এখনই ওকে আমি শেষ করে আসছি।" বন্দুক হাতে নিয়ে রক্ত চিহ্নিত তার পলায়নের পথ অনুসরণ করে চলতে শুরু করেছি, পিছন থেকে কানে এলো "থামো"। পাশে এসে দাঁড়ালেন স্যর এডোয়ার্ড গেট, বললেন, "আমি যাব তোমার সঙ্গে, একা বিপদের সম্মুখীন হতে তোমাকে দেব না তো।" বললাম, 'একটু অপেক্ষা করুন, বাঘ মরবেই, গুলি ওর ফুস্ফুস্ বিদ্ধ করেছে।"

তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি করে বুঝলে ?" দেখালাম রক্ত যেখানে পড়েছে সেখানে রক্তের মধ্যে রয়েছে বুদ্বুদ, যা অন্য কোন জায়গার রক্তে থাকা সম্ভব নয়। এ জঙ্গলটি পাহাড়ের উপর বা গায়ে নয়। প্রায় সমতল জমি। কোথাও বা ধীরে নেমে গেছে, কোথাও বা সামান্য উঁচু। আহত বাঘকে খোঁজবার সময়ে বৃক্ষারোহণে তৎপর একটি লোককে গাছে উঠিয়ে দেখে নিই, কাছে-পিঠে বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা ; আবার নামাই, এগিয়ে আবার ওঠাই, এবারও তেমনি করেই এগিয়ে চললাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি নালা নেমে গেছে, দেখি রক্তের দাগ। সেই নালাব মধ্যে নেমেছে সে। কোথায় যেতে পারে হিসাব করে নালাটিকে বাঁ পাশে রেখে ঈষৎ ঢালু পথে নেমে চললাম। কয়েক বার গাছে চড়ে দেখার পরই লোকটি ইসারায় দেখাল, বাঘ সামনেই শুয়ে আছে। দুজনেই বন্দুক তুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম, দেখি সামনেই পড়ে রয়েছে বৃহৎ বাঘের মৃতদেহ।

প্রথম দিনেই চারটি বাঘ মেরে সকলে খুবই খুশি। শিকারে গভর্নরের সঙ্গে এই আমার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

আট

বীর কেশরী সিং

চাইবাসা থেকে ছোট ভাই বিনয়ের চিঠি এলো শিকারের আহ্বান নিয়ে। সে লিখেছে "পত্রপাঠ চলে এসো। আমরা চিরিয়াডুইয়ার জঙ্গলে শিকারের মৎলব করেছি। তুমি, আমি, ইন্দু সরকার, কিশোরী চক্রবর্তী ও বীর কেশরী সিং।" বীর কেশরীর সঙ্গে শিকার এবং দেখাশুনা হবে মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

মনে পড়ে কাকামণির কাছে শোনা বীর কেশরীর পিতার কাহিনী। রেলপথ তখন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিরি-নদী-বন অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলকে সংযুক্ত করেনি, বাষ্পীয় শকটের লৌহপেশী সঞ্চালনে ছোটনাগপুরের বনপথ কেঁপে ওঠেনি, জীবনের গতিবেগ ছিল ধীর মন্থর। তখন গরুর গাড়ি অথবা পালকি করে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হত পরদেশীকে। ১৮৮৪-১৮৯২ সালে বি-এন-আর কোম্পানি আসানসোল, পুরুলিয়া, চক্রধরপুর, মনোহরপুর দিয়ে ছোটনাগপুরের দুর্গম বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে রচনা করে প্রথম রেলপথ। আমার কাকামণি শ্রীকান্তিভূষণ সেন এই রেলপথের জমি 'অ্যাকয়ার' করেন। সারা অঞ্চল তখন দুর্দান্ত বনের অধিকারে, প্রচুর জন্তু-জানোয়ারের বাসা। সেই সময় এই এলাকায় এক শিকারী জমিদার ছিলেন, নাম অভিরাম সিং তৃণ। কথায় বলে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' এই অভিরাম তৃণ ছিলেন শিকার এবং বাঘের গতিবিধি, স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী। গ্রামের লোকেদের বিশ্বাস ছিল তিনি বাঘ-সিদ্ধ। কেবল যে তাঁর নিজের প্রজারা তাঁর অনুগত ছিল তা নয়, ও এলাকার যাকে যখন তিনি যা বলতেন, সে তখনি তা মেনে নিত বিনা প্রতিবাদে। এর কারণ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বও বটে আবার কতক এই ভয় যে, তাঁর বাঘ চালান দেবার ক্ষমতা আছে, এই বিশ্বাসে। বাঘ চালান দেওয়া

মানে যে, তার গরু-মহিষ বাঘে মারবে। এই রকম একটা বিশ্বাস বা ভীতি গ্রামবাসীদের ভিতর প্রচলিত ছিল।

জনশ্রুতি যে, একবার জেলার পুলিশ সাহেব বাঘ শিকারের বাসনা প্রকাশ করায় সকলে তাকে অভিরামের সহায়তা নিতে পরামর্শ দেয়। অভিরামকে সাহেব ডেকে পাঠালে তিনি অভিবাদন করে দাঁড়ালেন, সব শুনে প্রশ্ন করলেন, "শিকার কবে করবেন?" সাহেব উত্তর দিলেন, "যে-কোন ছুটির দিন হলেই ভাল হয়, সামনের রবিবার নাগাদ।" আবার প্রশ্ন "কতদূরে শিকার করবেন?" "কাছের কোন জঙ্গলে হলেই সুবিধা হয়।" "আজ্ঞে পায়ে হেঁটে শিকার করবেন, না মাচায় বসে হাঁকোয়া করে?" সাহেবের আত্মাভিমান জেগে উঠলো, তিনি বললেন, "পায়ে হেঁটেই করব।" "কখন শিকার করবেন?" "সকালের দিকে হলেই সুবিধা হয়, এই ধর ব্রেকফাস্ট খেয়ে।" অভিরাম বললেন, "যে আজ্ঞে, কতো বড় বাঘ?" এবার সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তিনি রুখে ওঠেন, "তুমি কি তামাসা করছ আমার সঙ্গে, বলি বাঘ কি তোমার পোষা নাকি?" জিভ কেটে অভিরাম বলেন, "না-না ও-কি কথা বললেন, সব জেনে নিলাম, কারণ সেইমত বন্দোবস্ত করব তো।"

নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ সাহেব অশ্বারোহণে বাহির হন শিকারের জন্য সজ্জিত হয়ে, বনের প্রান্তে আগেকার নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষমান অভিরামের সঙ্গে মিলিত হন, তারপর দুজনে হেঁটে অগ্রসর হতে থাকেন। "এক ক্রোশের ভিতরই বাঘ পাওয়া যাবে হুজুর," আশ্বাস দেন অভিরাম। ক্রমশঃ বেলা বেড়ে ওঠে, হাঁটতে হাঁটতে ঘর্মাক্ত সাহেব জানতে চান, এক ক্রোশ কি এখনও হয়নি? "আমাদের জঙ্গলী লোকের ডালভাঙ্গা ক্রোশ, তার মানে চলতে চলতে ডাল ভেঙ্গে নিই, যেখানে গিয়ে তার পাতা মুষড়ে পড়ে, সেখানে হয় এক ক্রোশ আমাদের হিসাবে। তা একটু আগেই পাবেন," জবাব দেন অভিরাম। গভীর জঙ্গলে কিছুদূর গিয়ে ঝোপের ভিতরে একটা মোড়

ঘুরতেই আচমকা সাহেব দেখেন বিরাট বাঘ শুয়ে সামনেই। তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এত হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন যে যতবার বন্দুকে গুলি ভরতে যান, ততবার হাত থেকে গুলি পড়ে যায়। তাঁর অবস্থা দেখে অভিরাম তাঁর হাত থেকে বন্দুক তুলে বাঘটিকে একটি গুলিতে মেরে আবার তাঁর হাতে বন্দুক দিয়ে বলেন, "সাহেব, বোলো তুমিই মেরেছ।" তাঁর এলাকার বন এবং সেই বনের আনাচ-কানাচ তাঁর নখদর্পণে, গ্রীষ্মের দিনে বাঘ সাধারণতঃ তার "রাহানে" থাকবে তিনি জানতেন, তাই তাঁর জানা একটি রাহানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ হ'ল প্রচলিত গল্প। এই অভিরাম সিং তুণেরই উপযুক্ত ছেলে বীর কেশরী।

চাকরি জীবনের শেষে ১৯১৪-১৯১৫ সালে কাকামণি আবার কর্ম্ম-জীবনারম্ভের মধুর স্মৃতিময় সিংহভূমে বদলি হ'ন স্বেচ্ছায়। সেই সময় তিনি আমায় বীর কেশরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। খর্বাকৃতি কৃষ্ণকায় যুবক, সুদৃঢ় গঠন, তাঁর অন্তরের আত্মপ্রত্যয় যেন প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর মুখে। স্বল্পভাষী এবং বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনে বিশেষ বিচাবশীল, সহজে তিনি কাউকে বন্ধুত্বের সম্মান দিতে চাইতেন না। তীর-ধনুক এবং বন্দুকে ছিল তাঁব অব্যর্থ লক্ষ্য। তাঁর তীর-ধনুক দিয়ে মাছ শিকার এবং উড়ন্ত পাখী শিকার না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বীর কেশরীর চরিত্রের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল তাঁর অপরিসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাস। শিকারের কৌশল ছিল বিচিত্র ও অভিনব। আগেই বলেছি সিংহভূমের এ অঞ্চল গভীর বনে আচ্ছন্ন। বেশির ভাগই সংরক্ষিত বন। এমন বনও আছে যেখানে কখনও কাঠুরিয়ার কুঠার পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। বন যেন এখানে গৌরীর মত কুমারীব্রত অবলম্বন করে রয়েছে। একদিকে মধ্য ভারতের জঙ্গল এসে মিশেছে, অপর দিকে মিশেছে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, বোনাই, কেঁওনঝর ইত্যাদির গভীর বন। হাতী বাইসন বাঘ ভাল্লুক হরিণ শম্বর এ বনে যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ জন্তু-জানোয়ার বাঘ ছাড়া অন্য জন্তুকে ভয়

পায় না। একে অন্যকে কৌতুকপূর্ণ চমকিত দৃষ্টিতে দূর থেকে দেখে মাত্র, পালাবার প্রয়োজন আছে কিনা বিচার করে, দেখবামাত্র পালায় না। অনেক সময়েই হয়, একদিকে হয়ত বাইসন বা বন্য হস্তীর যূথ চরে বেড়াচ্ছে, তার কিছুদুরেই নিশ্চিন্তমনে হরিণ বা শম্বরেরা খাদ্যান্বেষণে মন দিয়েছে। বীর কেশরীর নিজের হাতী ছিল, তাকে তিনি নিজেই চালাতেন। অনেক সময় একাই সজ্জিত রাইফ্‌ল ও তীর-ধনুক পাশে রেখে হাতীর পিঠে লম্বা হয়ে শুয়ে হাতীকে জঙ্গলে নিয়ে যেতেন। নিজেকে হাতীর পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে ইসারা ক'রে তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুবতে কত জন্তু-জানোয়ারই চোখে পড়ত, যারা তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নয় বলে নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুরে ফিরে বেড়াতো। এই স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের মধ্যে ঘুরে ফিরে জন্তু-জানোয়ার দেখা ও অভিজ্ঞতা অর্জনই বীর কেশরীর আনন্দ ছিল।

বিনয়ের কাছে চাইবাসায় গেলাম। সে ছিল সেখানকার ইনকামট্যাক্স অফিসার। শিকারে তার আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত নেই, বড় ও হিংস্র জন্তু শিকার করেছেও প্রচুর। সিংহভূমের ঘন সংরক্ষিত বনময় পর্বতগুলিকে অজস্র পাকে বেষ্টন ক'রে চলে গেছে রাজপথ। কখনও পর্বত-শিখর অতিক্রম ক'রে কখনও বা তারই কোল বেয়ে। একদিকে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়, আর এক দিকে নেমে গেছে খাদ—ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেছে বন্য গাছপালার মাথায় মাথায়। শিকারের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে চাইবাসা থেকে আমরা চারজন গেলাম মনোহরপুর, যেখানে বীর কেশরীর বাড়ি। এখানে বেঙ্গল আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কম্পানীর লোহার খনি। লৌহময় প্রস্তরে ছাওয়া পাহাড়ের গায়ে এখানে লালচে আভা। গভীর বন চারিদিকে, তারই ভিতর দিয়ে অপরিসর রেলপথে স্টীল কম্পানীর ট্রলি খনির গর্ভ থেকে বহন ক'রে আনে লৌহের আকর। আমরা তারই একটিতে চ'ড়ে

কিছুদূর গিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছলাম। বীর কেশরী সেখানে লোক নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। বেলা বেশি হ'লে সাধারণতঃ জন্তু-জানোয়ার নিজেদের অভ্যস্ত বন ছেড়ে আত্মরক্ষা ও বিশ্রামের জন্য গভীর বনে আশ্রয় নেবার আগেই যাতে শিকার হয়, তাই তখনই বেরিয়ে পড়া গেল। সেদিন মাত্র একটি বাইসন শিকার হ'ল। শিকার শেষে একটু বন্দুকের নিশানা অভ্যাস করা হ'ল, তারপর বসা গেল গল্প-সল্পে। বীর কেশরীর একটি খুব হালের অভিজ্ঞতা শুনলাম, যা তাঁর অসীম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। এই বন্য এলাকায় মনুষ্য জাতি খুবই কম। প্রতি বর্গমাইলে এত কম অধিবাসী, এক হিমালয় প্রদেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগই আদিবাসী। প্রকৃতি এবং হিংস্র পশুর সঙ্গে সংগ্রাম তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং আজীবন অভ্যাস। প্রায় শৈশব থেকেই তারা ধরতে শেখে তীর-ধনুক, নিশানাও তাদের অব্যর্থ। এ ছাড়া জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব প্রতিরোধের অন্যান্য আরও অনেক উপায় তারা করে। অনুর্বর জঙ্গলময় জমির সামান্য ফসল বাঁচাবার জন্য গ্রামের আস-পাশের জঙ্গলের শুয়ার, হরিণ, খরগোস এমন কি পাখী পর্যন্ত মেরে শেষ ক'রে দেয় তারা। খাদ্যান্বেষণে ঘুরে-ফিরে বাঘ যখন এরকম জঙ্গলে আসে, তখন তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে গ্রামের গরু-মহিষ বা মানুষের উপরে। তা' না হ'লে তাদের উপবাস করতে হয়। হয় নিরীহ আত্মরক্ষায় অক্ষম মানুষকে শিকার সহজ ব'লে কিম্বা তার রক্ত মাংসের স্বাদ ভাল লাগে ব'লে ক্রমে তারা নরখাদক হ'য়ে দাঁড়ায়।

একবার বীর কেশরীর অঞ্চলে একটি বাঘ এমনি নরখাদক হয়েছিল। একই গ্রামের একই জায়গায় যে বার বার মানুষ ধরে তা নয়, আজ এ গ্রাম, কাল পাঁচ মাইল দূরে, ক'দিন পরে হয়তো আবার এ গ্রামেরই অন্যদিকে আরও দূরে। এমনি করে মানুষ মারায় সে

অঞ্চলে ভীষণ ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। সরকার থেকে যথারীতি এই নরখাদক বাঘ মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং ক্রমে বাড়তে বাড়তে পুরস্কারের মাত্রা এক হাজার টাকা পর্যন্ত ওঠে। বীর কেশরী এই নরখাদক বাঘ মারার সঙ্কল্প ক'রে বাঘের উপদ্রুত অঞ্চলের মাঝামাঝি গ্রামে ডেরা বাঁধলেন এবং চারিদিকের প্রজাদের ডেকে বললেন, বাঘে কোথাও মানুষ মারলেই সেখানে প্রহরায় লোক রেখে যেন তাঁকে যত শীঘ্র সম্ভব খবর দেওয়া হয়। একদিন দুপুরের কিছু পরে খবর এল, কাছের গ্রামে বাঘে একটি লোককে কিছুক্ষণ আগে মেরেছে। শোনামাত্র বীর কেশরী সেখানে চলে গেলেন। গিয়ে দেখেন মৃতদেহ পড়ে আছে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার ঘাড়ের কাছ থেকে। বাঘ কাঁধের উপরে এক কামড় দিয়ে তার বুক-পিঠের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষতস্থানের রক্তটুকু চেটে খেয়ে গেছে। তিনি চারিদিকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে মৃতদেহটি সরিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন এবং মৃতব্যক্তির পরিধেয় কটিবস্ত্রের অনুরূপ একটি আধ-ময়লা কটিবস্ত্র পরে যেখানে যেভাবে মৃতদেহটি পড়ে ছিল, সেইভাবে পড়ে রইলেন, পাশে গুলিভরা রাইফ্‌ল নিয়ে। সঙ্গের লোকজন সকলকে দূরে গ্রামে চলে যেতে বললেন এবং গুলির শব্দ না হ'লে কোনমতেই কাছে আসতে বারণ করলেন।

মৃতের আত্মীয়স্বজন যারা সংবাদ পেয়ে এসে কাঁদছিল, তারা নিয়ে গেল মৃতদেহটি। প্রখর রৌদ্রতেজে যেন অগ্নিবর্ষণ করছে, তার মধ্যে নগ্ন গায়ে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে আছেন বীর কেশরী, মৃতের রক্তধারার প্রায় উপরে শুয়ে। সেই রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অজস্র মাছি এসে ঘিরে ধরেছে তাঁকে, মুখে মাথায় সর্বাঙ্গে ক্রমাগত বসছে। পিঁপড়েরা সারিবদ্ধভাবে আগামী বর্ষার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যস্ত। তারাও তাদের পথের উপর পড়ে থাকতে দেখে কামড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু এক চুল নড়ার উপায় নাই, তিনি যে তখন মৃত, নিঃশ্বাস পর্যন্ত জোরে ফেলার উপায় নাই! দূর থেকে বাঘ যদি তাঁকে দেখতে

পায় এবং সন্দেহ হয় তাহলে তো সবই পণ্ড হ'য়ে যাবে। মনের ভিতরেও চলেছে চিন্তার বিরামহীন প্রবাহ। হয় নিজে মৃত্যুবরণ করবেন, নয় মৃত্যু হানবেন, এজন্য তো প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তবুও নানা চিন্তা আসে মনে, বাঘ কোন্ পথে আসবে, কি রকম অবস্থা হ'লে কিভাবে সম্মুখীন হবেন, ইত্যাদি। রাইফ্‌লে গুলি তো ভরেছেন ? সেটা ঠিক আছে তো ? শেষ মুহূর্তে সেটা খারাপ বেরিয়ে প্রতারণা করবে না তো ? গ্রীষ্মের তপ্ত হাওয়া মাঝে মাঝে হু হু শব্দে ব'য়ে যায়। অধীর অপেক্ষায় সময়ের গতি যেন মন্থর হয়ে গেছে। ক্রমে অপরাহ্ণের আলো ম্লান হয়ে এল। প্রতি মুহূর্তে বাঘের আগমন ও শব্দ মনে ক'রে, সমস্ত চেতনা ও সর্বশক্তি সজাগ রেখে উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। কিসের ক্ষীণ শব্দ হ'ল মচ্, গাছ থেকে শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়ল, না বাঘের পায়ের চাপে ভাঙ্গলো ? বাঘ সত্যিই আসছে, কিন্তু এখনও দূরে ! স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বাঘ দূর থেকেই চারিদিক ঘুরে দেখে নেয় মরা আছে কিনা, সন্দেহের কোনও কারণ আছে কিনা। তারপর ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে আসে কাছে, আরও কাছে। আরও একটু কাছে আসুক। নিকট থেকে নিকটতর হয় পদশব্দ। আরও কাছে, আরও একটু। যখন বাঘ মাত্র আট-দশ হাত দূরে, তখন বাঘের দিকে ফিরে ঝট্ ক'রে বন্দুক হাতে উঠে বসলেন বীর কেশরী। নিশ্চিন্ত অসতর্ক বাঘ এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল, বীর কেশরীর ভাষায় "লাজায় গিয়া"। মুখ অর্ধেক খোলা। মুখের চারিপাশে দাঁতগুলি বেরিয়ে আছে, জিভও একটু বের করা, চোখে হিংস্র দৃষ্টি, কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। পলমাত্র, সেই পলমাত্র সময়েই তাঁর রাইফ্‌লের একটি গুলি বাঘের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিল।

ঘটনাটি শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি চারিদিকে শুকনো পাতা ছড়িয়ে রেখেছিলেন কি ?" তিনি জবাব দেন, "হ্যাঁ"। চারিপাশে জঙ্গলের শুকনো ঝরা পাতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে অতি

লঘু-গতির ক্ষীণতম শব্দও শ্রুতিগোচর হয়। তাছাড়া ধরিত্রী মাতাও শব্দের উত্তম বাহক। যে সব ক্ষীণ পদশব্দ শ্রুতি-সীমার বাইরে, তাও শোনা যায় অনেক সময়ে পৃথিবীর বুকে কান পেতে। তাই বীর কেশরী তাঁর সমস্ত চেতনা জাগ্রত ক'রে মাটিতে শ্রবণ সংযোগ ক'রে নিশ্চল হ'য়ে প্রতীক্ষা করছিলেন, সেই কালান্তক নরখাদকের অপেক্ষায়। বনের নিস্তব্দতা ভেদ ক'রে যখন কানে এল ভারি ওজনের চলার ক্ষীণ শব্দ এবং পরে শুকনো পাতার শব্দ, তখনই বাঘ আসছে জেনে শব্দের গতি লক্ষ্য করেই বুঝলেন, কোন্‌দিক থেকে কত কাছে বাঘ এসে পোঁছেছে। যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেও গুলিতে মৃত্যু অনিবার্য, তখনই উঠে বসলেন তার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে।

বহুদিন তার আর কোনও সংবাদ জানি না, জানি না তিনি আজ কোথায়। আজ হয়তো তিনি জরাগ্রস্ত স্থবির, কিন্তু আমার কল্পনায় তাঁর স্মৃতি চির নবীনের অপরিমেয় আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত চিরযুবকের হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নয়

প্রসাদ

যতক্ষণ কোন জিনিসকে আমাদের নিজেদের বুদ্ধি এবং জ্ঞান দিয়ে না দেখি ততক্ষণ সেই অজানার প্রতি সাধারণতঃ থেকে যায় একটা সন্দেহ, একটা ভীতি। সাপ সম্বন্ধে আমাদের ভীতিও কতকটা সেই রকমের, ওটা আমাদের যেন সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। ভয় করবার কিছু নাই সেকথা বলি না, তবে সাপ শুনলেই যে অনেকের আতঙ্ক হয়, সেই কথাই বলছি।

১৯১০ সাল। চাকরি জীবনের আরম্ভে তখন রাঁচিতে আছি। বর্ষায় সব রাস্তা অগম্য হয়ে ওঠার আগেই কয়েকটা কাজ শেষ করবো বলে রাঁচি জেলার বুড়মুতে গেলাম। শিকার জীবনেরও সেটা শিক্ষানবীশীর অধ্যায়, সবে নতুন বন্দুক কিনেছি। বড় বাঘ না মারলেও তখন বড় বাঘ শিকারের কল্পনাতে মগ্ন থাকি। গ্রামবাসীরা বলল, আস-পাশের জঙ্গলে হরিণ আছে প্রচুর, শিকারে যাব কি না। রাজি হয়ে গেলাম। প্রথম বর্ষার ছোঁয়ায় বনে লেগেছে সবুজের আভাস। যেখানে গিয়ে বসলাম তার অদূরেই একটি নদী সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে দক্ষিণ থেকে বামে, তার অস্পষ্ট কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। গাদা বন্দুক নিয়ে দুজন স্থানীয় শিকারী আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁরা আলাদা আলাদা বসেছেন। মাটিতেই আমাদের আসন। কিছুক্ষণ বসার পরই মশার উৎপাতে অস্থির হ'য়ে উঠলাম। শিকারের প্রাথমিক নিয়ম স্থির হ'য়ে বসে থাকা। তা রক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠায় শিস্ দিয়ে কাছের একজন শিকারীকে ডাকলাম। কাছে এসে সে ব্যাপার শুনে সামনের সালে গাছ থেকে কতকগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বেশ করে হাতে কচ্‌লে আমার সারা

হাতে-মুখে-ঘাড়ে তার রস লাগিয়ে দিল। অনেকটা রাধুনীর মত গন্ধ সেই পাতার। তাতে ফল হল, মশারা এসে ভন্ ভন্ করে উড়ে বেড়ালেও গায়ে বসা বন্ধ কর'ল। হাঁকোয়ারা অনেকখানি জঙ্গল ঘিরে নিয়ে হাঁকোয়া করছিল, তাতে বেশি জানোয়ার আসবে, এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে। কিন্তু তাতে তারা হরিণ দেখলেও সে হরিণ আমাদের সামনে আর আসেনি। যাই হোক, দেড় ঘণ্টা পরে, লম্বা হাঁকোয়া যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, তখন কাছেই শুনি কয়েকজন মিলে লাঠি দিয়ে কি যেন আঘাত করছে। প্রথমে ভাবলাম, কোন জন্তু তাড়িয়ে আনছে। কিন্তু তারপর চুপ-চাপ দেখে হাঁকোয়াদের জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার। একজন জবাব দিল—"উ একঠো সাঁপ হৈ"। "সাপ? কি সাপরে?" "উ এগো গহুমন" অর্থাৎ গোখরো, যেন কিছুই নয়। বল'ল, মেরে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। বললাম, "করেছিস কি, সাপ কখনও জলে ফেলে? উঠিয়ে আন শীগগির।" উঠিয়ে আনলে দেখলাম একটা বড় গোখরো সাপ। তার মাথাটা থেঁতো করে ফেলে দিলাম।

শিকারে আর মন বসল না, গাদা বন্দুকধারীদের শিকার করতে দিয়ে ফিরে চললাম। আমি আগে আগে, পিছনে কজন হাঁকোয়া। তাদেরই একজনের হাতে আমার বন্দুক। হঠাৎ স্-স্-স্-স্ শব্দে চেয়ে দেখি ফুট সাতেক লম্বা এক গোখরো সাপ আমার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। গ্রীষ্মের ঝরা পাতা গ্রামবাসীরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সেই আগুনের হলকায় মুষড়ে ঝরে পড়া পাতার উপর দিয়ে চলেছে। পিছনের লোকটির হাত থেকে চট্ করে বন্দুক নিয়ে গুলি করলাম। করতেই সে শরীরের সব ভার ল্যাজের দিকে দিয়ে উঁচু হয়ে মস্ত ফণা মেলে বৃত্তাকারে শোঁ করে ঘুরে গেল এবং এক ছোবল দিল। মাত্র চার-পাঁচ ইঞ্চির জন্য আমার নাগাল পেল না। ছর্‌রাতে তার ল্যাজের দিকের খানিকটা ঝাঁঝরা হ'য়ে যাওয়ায় তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছিল, আমার উপর প্রতিশোধ নিতে তাই

তার এই ব্যর্থ চেষ্টা। তারপর চক্ষের নিমেষে বিদ্যুৎগতিতে আমার ফুট চারেক দূরে একটা পাৎলা শাল গাছের গুঁড়িতে শট ক'রে জড়িয়ে গেল। দ্বিতীয়বার বন্দুক তুলে আমার বন্দুকের দ্বিতীয় নলটি খালি করলাম। তখনকার দিনের 'ব্ল্যাক-পাউডার কার্ট্রিজ। তার ধোঁয়া পরিষ্কার হতেই দেখি সাপ আর সে-গাছে নেই। কাছে গিয়ে দেখলাম, রক্ত লেগে আছে। বুঝলাম গুলি লেগেছে, কিন্তু সে গেল কোথায়? আসে-পাশে খুঁজতে খুঁজতে দেখি সেই সালে গাছের কাছে একটা উইয়ের ঢিপি। বর্ষার জলে তার একটা দিক গলে গেছে, তার এদিক-ওদিক খুঁজছি, এমন সময় ফণা তুলে গর্ত থেকে হাতখানেক মাথা বের করল। বুঝলাম গুলি তার শরীরের মাঝামাঝি লেগেছে। তাতে হাড় ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু ল্যাজের দিকটা কেটে আলাদা হ'য়ে খসে যায়নি, তাই সবটা টেনে নিয়ে চলা তার পক্ষে কঠিন হ'য়ে পড়েছে। কাছের একটা নতুন সরু শালগাছ কাটিয়ে তাই দিয়ে উইয়ের ঢিপি ভেঙ্গে তার ভিতর থেকে টেনে বের করলাম। আঘাত, প্রতিহিংসা ও রোষে তখন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে—সমানে গর্জন করছে ফোঁস ফোঁস শব্দে আর নিষ্ফল ছোবল মেরে চলেছে সেই কাটা শালগাছটির উপরে। একটা লাঠি দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে বললাম, "আন মহুলানের লতা"। তাই দিয়ে ফাঁসি লাগিয়ে তাকে বেঁধে ল্যাজের ক্ষত অর্ধেক কেটে বাদ দিয়ে একটা নবোদ্গত শাল গাছের লম্বা টুকরার মাঝে তাকে বেঁধে নিয়ে চললাম। প্রাণ বড় শক্ত, সহজে যেতে চায় না। নিচের অতখানি কেটে বাদ অনেকক্ষণ বেঁচে রইল। তারপর যখন তাকে বুড়মু ইন্সপেকশন বাংলাতে নিয়ে এলাম, তখন সে মরে গেছে। তার মুখটা হাঁ করিয়ে দেখলাম দুপাশে সরু দুটি দাঁত দুটি বিষের থলির সঙ্গে সংলগ্ন। দাঁতের ভিতরে খুব সূক্ষ্ম ছেঁদা। রাগ ক'রে ওরা বিষের থলির পেশীতে চাপ দিলেই ভিতরের বিষ ইন্জেকশনের ছুঁচের মত দাঁত দুটির ভিতরের নালি দিয়ে বেরিয়ে আসে।

দুজনে আপন আপন পথে চলেছিলাম, কোন বিরোধ ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হ'ল, একজনকে পরপারে যেতেই হ'ল। এ যাত্রায় সেই গেল। বাংলার কাছেই একটি কাচ্‌নার (কাঞ্চন) গাছ ছিল। তার ছায়ায় গহুমনের আধখানা দেহ সমাহিত ক'রে একটি পাথর খাড়া করে দিলাম তার উপরে। ঘটনাটি ভুলতে পারিনি, তাই ১৯১৪ এবং ১৯২৮ সালেও যখন কাজে বুড়মুতে গেছি, সেই পাথরটি তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখে এসেছি।

তারপর অনেক সাপের সংস্পর্শে এসেছি। মন্থর গতি অজগর থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রবোড়া পর্যন্ত, বহু সাপও মেরেছি। অবশেষে ১৯৩১ সালে একবার পরেশনাথের কাছে আমার এক বন্ধু থাকতেন, নাম প্রমথনাথ দাশগুপ্ত, তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে, সুহৃদ্‌ বিশ্বপতি গুপ্ত ও ভাগ্নে শচীকে নিয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়লাম তাঁকে দেখতে। প্রমথের সঙ্গে দেখা করে মেঘচুম্বী পরেশনাথ পাহাড়কে পিছনে রেখে ফিরে চলেছি হাজারিবাগ, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। দুপাশে উন্মুক্ত প্রান্তর। তার মধ্যে এক জায়গায় দেখি রাস্তার পাশে কয়েকজন লোক মাঠের দিকে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। তাদের পাশ দিয়ে পার হয়ে যেতেই শচী ও বিশ্বপতি বলে উঠল, "বাঃ, সুন্দর সাপ তো, ফণা ধরে রয়েছে।" ওদের কথা শুনে তখনই গাড়ি পেছিয়ে নিয়ে গেলাম। পথের ধারে রাস্তা মেরামতের জন্য মাটি কাটার একটি গর্তের মতন, সেখানে একটি কাল কেউটে সাপ, চার ফুট আন্দাজ লম্বা, মাথা তুলে ফণা বিস্তার ক'রে রয়েছে, আর দূরে দাঁড়িয়ে কাছাকাছি গ্রামের পথচারীরা তাই দেখছে।

এর কিছুদিন আগে মিহিজামের শ্রদ্ধেয় ডাঃ পি ব্যানার্জির একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম যে, সাপের সংস্কৃত নাম 'চক্ষুশ্রবা', ওরা চোখ দিয়ে শোনে। যখন দেখে তখন শোনে না, যখন শোনে তখন দেখে না। প'ড়ে পর্যন্ত মনে খুব একটা আগ্রহ ছিল এটা পরীক্ষা করে দেখবার। জন্তু-জানোয়ার পশু পাখী প্রায় সব রকমই পুষেছি,

কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি তাদের বৈশিষ্ট্য। দেখেছি নেকড়ে এবং জংলী কুকুর বা "কোইয়া" কখনও পোষ মানে না, চিতাকে কোন সময়েই বিশ্বাস করা চলে না এবং বাঘের রাজকীয় খেয়ালী স্বভাব। ওয়ালফোর্ডের শ্রীমণি মেহতা একবার বলেন, তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা আমার পোষা বাঘের বাচ্চা নিয়ে ছবি তুলবেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যখন প্রস্তুত হ'য়ে এলেন, তাঁর চক্‌চকে নীল রেশমের শাড়ী দেখে বাঘের কি যে ভীষণ মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেল, কিছুতেই ছবি

তুলতে দিল না। পরে তিনিই যখন অন্য শাড়ী পরে এলেন, সেই বাঘই অতি শান্ত হয়ে বসে রইল।

স্থির করলাম সাপটিকে ধ'রব এবং পু'ষব। বিশ্বপতিকে বললাম, আমি সংকেত করলেই যেন গাড়ির ইলেকট্রিক হর্ন টিপে দেয়। ওদের তো মহা আপত্তি যে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে গিয়ে প্রাণ না হারাই। যাই হোক, গাড়ি থেকে নেমে যে লোকগুলি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কাছ থেকে খানিকটা পাতলা সুতোর দড়ি নিয়ে তাতে একটা ফাঁস দিলাম, কারণ ভেবে দেখলাম শুধু হাত দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরতে গিয়ে একটু নিচে ধরলেই সে ছোবল মারবে। কিন্তু দড়ির ফাঁসি লাগিযে সুতোর দুপাশ ধরলে সহজে ছোবলাতে পারবে না।

বিশ্বপতিকে সংকেত করতেই সে ইলেকট্রিক হর্নটিকে টিপে দিল। নতুন অবার্ন-গাড়ির জোর হর্নের শব্দে সাপটা যেদিক থেকে শব্দ আসছে সেই দিকে মাথা ঘোরাল। সাপ যেদিকে মুখ করে আছে তার উল্টো দিক দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার গলায় ফাঁস পরিয়েই পা দিয়ে তার ল্যাজ চেপে ধরলাম। সাপ তখন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল, আমাকে ল্যাজ দিয়ে জড়াতে, কিন্তু তার সে উপায়ও নেই। শচীকে বললাম, "একটা মাটির হাঁড়ি ঢাকনাসুদ্ধ জোগাড় করতে পারিস?" কিন্তু কাছাকাছি কোন মনুষ্যবসতি নেই। গ্রাম মাইলখানেক দূরে। বললাম, "যা সেখান থেকে নিয়ে আয়"। আমি ততক্ষণ দুপাশের সুতো আঙুলে জড়িয়ে খাটো ক'রে এনে তার গলা হাত দিয়ে চেপে ধরেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই হাঁড়ি ও ঢাকনা এসে পড়লো। হাঁড়ির মুখটা খুলে তার কাছে সাপের মাথাটা নিয়ে একটু আলগা দিতেই সে সুড সুড় করে তার মধ্যে ঢুকে গেল। তখনি তাকে সরা চাপা দিয়ে হাঁড়ির মুখে রুমাল বেঁধে মোটরে করে বাড়ি নিয়ে এলাম।

আমার বড় দিদি এবং ভগ্নীপতি তখন আমার কাছে এসেছেন। বাড়ির সকলে সন্ধ্যা বেলায় একসঙ্গে বসে গল্প করছেন। এমন সময়

বাড়ি ঢুকলাম, হাঁড়ি হাতে। ডেকে বললাম, "তোমাদের জন্য প্রসাদ এনেছি, কি প্রসাদ যদি বলতে পার দশ টাকা দেব"। প্রসাদ শুনেই সকলে ভক্তিভরে হাঁড়িতে মাথা ঠেকালেন, তারপর অনুমানের পালা। কেউ বলে হালুয়া, কেউ বাতাসা, মায় পাঁঠার মাথা পর্যন্ত। তখন বললাম, "তোমরা কেউ পারলে না, সাক্ষাৎ মা মনসা—একটি কাল কেউটে।" যেমনি বলা সবাই চেঁচামিচি শুরু করে দিলেন। বাড়ির দোতলার দালানের মেঝেটা খুব পালিশ ছিল। বাড়ির সকলকে গ্যালারির মত সিঁড়ির উপরে বসিয়ে সেই দালানে যেই হাড়ির মুখ খোলা, ফোঁ-ও ও-স্ করে সাপ হাঁড়ি থেকে ফণা তুলে বেরিয়ে এল। কিন্তু পালিস করা মেঝেতে তার তাড়াতাড়ি চলার ক্ষমতা নাই। তীব্র প্রতিহিংসার রোষে তখন সে ফুলছে। তার সামনে কাপড় নাড়াতে ফোঁস ক'রে এক ছোবল মারল। আমি দ্রুত সরে গেলাম, মাটির উপর ছিটকে পড়লো খানিকটা পীতাভ তরল পদার্থ—তার বিষ। সকলের সমবেত চিৎকার উঠল, "ওকে মেরে ফেলো শীগ্গির।" স্ত্রীর অজস্র বকুনি, বড়বোনের দিব্যি, ভগ্নীপতির অভিমান একসঙ্গে সব-কিছুর তাড়ায় শেষ পর্যন্ত আমার সব আপত্তি অনুরোধ ব্যর্থ ক'রে ভগ্নীপতি তাকে সর্প জীবন থেকে মুক্তি দিলেন। অতএব সাপ পোষবার সাধ মনেই রয়ে গেল, পোষা আর হ'ল না।

দশ

গোকুল সিং

আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ল গোকুল সিংহের স্ত্রী আমাকে দেখে—"কোথায় ছিলি তুই এতদিন, আমার স্বামী তোর এত-দিনের পুরনো শিকারী, লাটসাহেবের এত শিকারে এতদিন সে ঘুরল তোর সঙ্গে, কোনদিন কিছু হ'ল না, আজ তুই থাকতে তার অপমৃত্যু হ'ল, তাও হাসপাতালে আমাদের সকলের থেকে দূরে। বাঘ আমাদের প্রতিবেশী, কোনদিন কিছু হ'ল না, শেষে সেই বাঘের হাতে তাকে মারলি!" পিতৃহারা শিশুরাও কাঁদতে লাগল, তাদের মায়ের সঙ্গে। পালামৌর দুর্ভেদ্য বনের মধ্যে কেড়ের ক্ষুদ্র গ্রামপ্রান্তে গোকুলের কুটির প্রাঙ্গণে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম, সান্ত্বনার সব ভাষাই অশ্রুতে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। চোখের সামনে ভাসতে লাগলো গোকুলেব দৃঢ় নির্ভীক চেহারা। আমার একান্ত অনুগত শিকারী, কতদিনের কত বিপন্ন অবস্থার সাথী। যে চলে গেছে তাকে তো ফিরিয়ে আনা যাবে না, তবুও যারা রইল তাদের বাঁচাতে হবে। জীবনেব পথ বড়ই দুর্গম। চলার পথে প্রিয় সাথী, প্রাণাধিক সন্তান, যারা একান্ত আপন, যাদের ছাড়া জীবনই অর্থহীন, কত সময়ে তারা যায় হারিয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে। তবুও এগিযে যেতে হবে, চলতে হবে শেষ পর্যন্ত। গোকুলের স্ত্রীর কান্না শুনে গ্রাম-বাসীরা একে একে এসে সমবেত হ'ল, তারাও অশ্রু বর্ষণ করতে লাগল। নানারকম সান্ত্বনা তারা দিতে লাগল গোকুলের বিধবাকে এবং প্রতিশ্রুতি দিল, ক্ষেত জোত করে ফসল উৎপাদন ক'রে দেবে। সরকারের পক্ষ থেকে গোকুলের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু জমিজমা এবং শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্য অর্থ দেবার ব্যবস্থা করতে এবং তাদের গভীর দুঃখে-শোকে সমবেদনা জানাতে

পাঠিয়েছিলেন আমাকে মিঃ বার্থুড, ছোটনাগপুর ডিভিশনের কমিশনার। আর্ত রমণীর করুণ ক্রন্দনে আমার নিজের অশ্রুও সংবরণ করতে পারিনি। বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম সেই কুটিরপ্রাঙ্গণে গোকুলের ছেলেকে কোলে নিয়ে। গোকুলের একমাত্র সন্তান—বছর দশেক তখন তার বয়স। সাধ্যমত সান্ত্বনা দিয়ে আমার কাজ শেষ ক'রে ডালটনগঞ্জ ও রাঁচি হয়ে হাজারিবাগে ফিরে এলাম। কতদিন পর্যন্ত ভুলতে পারলাম না গোকুলকে।

কয়েক বছর ধরে পালামৌ খাসমহল ও তৎসংলগ্ন কতকগুলি সংরক্ষিত জঙ্গলে গভর্নরের শিকারের কেন্দ্র গ'ড়ে তুলেছিলাম। প্রতি বছরই বড়দিনের সময়ে বিহার ও উড়িষ্যার গভর্নর ও তাঁর নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতেন শিকারে। পালামৌ রাঁচি ও হাজারিবাগ তিন জেলা নিয়ে তখন আমার কর্মস্থল। শিকার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার ছিল আমার উপরে এবং সব বন্দোবস্ত খাসমহলের প্রজাদের উপরে। প্রকৃত শিকারী তারাই, তারাই নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে জন্তু-জানোয়ার নিয়ে আসতো বন্দুকের সামনে। গোকুল সিং ছিল কেড় জঙ্গলের এই সব শিকারীদের নেতা। জন্তু জানোয়ারের চাল-চলন রীতিনীতিতে সে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। কেড়ের বনের প্রতি কোণা-ঘুচি জন্তু-জানোয়ারেব ও বড় বন্য পাখীর আবাস তার নখদর্পণে ছিল। পেদচিহ্ন দেখে অনুসবণ করায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। শিউধারী এবং গাকুল, এরাই কেড়ের শিকারের অপরিহার্য অঙ্গ, গ্রামবাসীদেরও তাদের উপরে প্রগাঢ় আস্থা ও নির্ভর।

সাধারণ নিয়ম ছিল গভর্নরের নিমন্ত্রিত অতিথি ব্যতীত অন্য কেউ এই জঙ্গলে শিকার করলে তার অনুমতি নিতে হ'ত গভর্নরের। সে বছর বড় দিনে অন্য কাজে আবদ্ধ থাকার জন্য গভর্নরের শিকার বন্ধ রইল, সেই অবসরে তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজ মাননীয় মেম্বর শিকারের অনুমতি নিলেন। তাঁর শিকারের সব

বন্দোবস্ত করা যখন আমার শেষ হয়ে গেছে, তখন আমার উপরওয়ালা বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ছুটিটা বাড়িতে কাটাতে চান, তা আপনি যান না, কদিন ছুটি উপভোগ করে আসুন।" বুঝলাম, আমি অবাঞ্ছিত। কাজেই আমিও তখনই সরে এলাম শিকারের ক্ষেত্র থেকে সোজা হাজারিবাগ।

১লা জানুয়ারি। সকালেই কমিশনার রাঁচি থেকে আমার হাজারিবাগের বাড়িতে ফোনে ডেকে বললেন, "বিজয় তুমি একবার এখনই আসতে পার? বিশেষ প্রয়োজন।" জবাব দিলাম, "দু ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছব।"

বেলা ৯টায় রাঁচিতে কমিশনার মিঃ বার্থুডের বাড়ি আমি যেতেই তিনি আমায় বললেন—"একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বিজয়। মাননীয় মেম্বরের শিকারে তুমি এবার কেন সরে এলে বলতো?" তাঁকে কারণ বললাম। দুর্ঘটনার কথায় তিনি বললেন, "মাননীয় মেম্বর ৩০শে বিকেলে শিকারে যান। বেড়ের জঙ্গলে বাঘের হাকোয়ায় বড় বাঘকে তিনি গুলি করেন, তাতে বাঘ আহত হয়। তাকে খুঁজে বা'র করতে গিয়ে একজন শিকারী ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। কাল গভীর রাত্রে ডেপুটি কমিশনার এক বিশেষ পত্রবাহক মারফৎ মোটরে ডালটনগঞ্জ থেকে এই খবর পাঠিয়েছেন। চিঠিখানা তিনি আমাকে দেখালেন। তাতে আমার শিকারী গোকুলের নাম দেখে বড়ই মর্মাহত হলাম। এই সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের হ'তে লাগল, এমন সময় একখানি মোটর গাড়ি বাইরে আসার শব্দ পেলাম এবং একটু পরেই চাপরাসী চিঠি এনে দিল। পড়ে শুষ্ক মুখে মিঃ বার্থুড বললেন, "সে মারা গেছে এই খবর এল। দেখ, আমি চাইনা যে গ্রামবাসীদের ভিতর এমন একটা কথা ওঠে যে, 'সাহেবেরা করে শিকার, আর গরিব আমাদের যায় প্রাণ।' সে বড়ই বিশ্রী ব্যাপার। তোমার উপর গ্রামবাসীদের অগাধ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা, তুমি এর

উপযুক্ত ব্যবস্থা কর যাতে সব ঠাণ্ডা হয় এবং অশোভন না হয় সব ব্যাপারটা।" আমি তখনই পালামৌ রওনা হয়ে গেলাম।

গোকুলের মৃত্যু সম্বন্ধে এইটুকুই জানতাম। বিস্তারিত বিবরণ শুনলাম তার গ্রামের আমার অন্যান্য শিকারীদের কাছে, যারা নিজেরা উপস্থিত ছিল সে ক্ষেত্রে। ঘটনাটি এই।

কেড়ের জঙ্গলে শিকার হচ্ছে। ঘন শালের দুর্ভেদ্য বন, দিবা-লোকের পথ রোধ করে আছে। আধ-আলোছায়াতে ঘাস বেড়ে উঠেছে কোথাও কোথাও হাতী পর্যন্ত ডুবে যায়, এত লম্বা। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড় যেন প্রকৃতির অন্তরের শ্যামলিমা ফোয়ারা হয়ে উৎসারিত হয়েছে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের মাঝে কোথাও কোথাও এমনি চার-পাঁচ মাইলব্যাপী জঙ্গল। বাঘ, ভালুক, বাইসন, শম্বর, চিতা, হরিণ, ময়ূর, মুরগী, সকলেরই আশ্রয় এই বন। ভক্ষ্য এবং ভক্ষক উভয়েই এখানে বেড়ে উঠেছে। মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে এরা সংখ্যা বৃদ্ধিও করে চলেছে।

কেড় থেকে বার মাইল দূরে শিকারের ক্যাম্প। কেড়-জঙ্গলে বাঘে মোষ মেরেছে, সকালে এই দেখে এ খবর শিকারীরা গিয়ে লাটের ক্যাম্পে দিল। সংবাদ পেয়ে সাজসজ্জা করে প্রস্তুত হয়ে শিকারীরা এসে যখন মাচায় বসলেন তখন বেলা দ্বিপ্রহর। জঙ্গল খুব ঘন, একটু দূরের বেশি চোখে দেখা যায় না। উপরের থেকে যাতে দৃষ্টিসীমার পরিধি একটু পরিসরতর হয় এই জন্যই মাচা বাঁধা। গাছ অবলম্বন করে আঠ-দশ ফুট উঁচুতে মাচা বাঁধা হয় বাঘের স্বাভাবিক গতিপথের উপরে। হাঁকোয়া শুরু হল। হাঁকোয়ারা যথা-রীতি ধীর পদক্ষেপে জন্তু তাড়িয়ে নিয়ে আসতে লাগল, যাতে তাড়া খেয়ে তারা নিজের স্বাভাবিক গতায়াতের পথেই যায়। বেশি তাড়া দিলে সে পথ ত্যাগ করে যেদিক সেদিক দিয়ে চলে যাবে, মাচার সামনে আর আসবে না। সেদিনও বাঘ তাড়া খেয়ে সম্ভাবিত পথে সম্মানিত অতিথির মাচার সামনেই এল এবং তিনি বাঘের ঘাড়

লক্ষ্য করে গুলি করলেন। গুলি লাগল, কিন্তু বাঘ মরল না, ভীষণ গর্জনে বনের হৃদয় কম্পিত করে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাঁকোয়ারা গুলির শব্দও শুনল, বাঘের গর্জনও শুনল, বুঝল বাঘ আহত: মাচা থেকেও সেই সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হ'ল। তখন তারা হাঁকোয়ার নিয়ম অনুসারে যে যেখানে আছে দাঁড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করতে লাগল, যাতে বাঘ আবার ফিয়ে যায়, কিন্তু বাঘ না গেল ফিরে, না হাঁকোয়াদের শ্রেণী পার হয়ে পালাল। চারিদিকে নেমে এল নিস্তব্ধতা। আহত বাঘ যে কোথায় মাটি নিয়ে আছে তাও দৃষ্টিগোচর হ'ল না। মাচার শিকারীরা কেউ নেমে বাঘকে খুঁজে মারতে গেল না, নিরস্ত্র লাঠি-মাত্র সম্বল হাঁকোয়ারাও ভরসা পেল না সাক্ষাৎ কালান্তক বাঘের খোঁজ করতে। এদিকে শীতের স্বল্পায়ু দিন শেষ হয়ে এল। তখন মাননীয় অতিথি এবং ডেপুটি কমিশনার আলোচনা করে স্থির করলেন যে; গুলি যখন লেগেছে, পাঁচশো বোর রাইফেলের গুলি, বাঘ তখন মরবেই। রাতের মধ্যে একান্ত যদি নাই মরে, পরের দিন সে একটু নিস্তেজ হয়ে এলে তখন খুঁজে বের করা সহজ হবে। সেই অনুসারেই নির্দেশ দেওয়া হল হাঁকোয়াদের। কিন্তু পরের দিনই মাননীয় মেম্বরকে ফিরে যেতেই হল, তাই তিনি ডেপুটি কমিশনারকে বলে গেলেন, বাঘকে মৃত অবস্থায় যদি পাওয়া যায় চামড়াটা তাঁকে পাঠিয়ে দিতে।

পরদিন হাঁকোয়াদের নির্দেশ দেওয়া হল, আহত বাঘকে খুঁজে বা'ব করতে হবে। তারা মোষ নিয়ে এগিয়ে চলল খুব সাবধানে। কিছুক্ষণ খোঁজবার পরই মোষের সাড়া পেয়ে সগর্জনে বাঘ জ্ঞাপন করল তার অস্তিত্ব—কেবলমাত্র অস্তিত্ব নয়, তার তেজ এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তাও তার কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল। মোষেরা এদিক-ওদিক পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিছুতেই তাদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাখা গেল না। ভীত হ'য়ে হাঁকোয়ারা তখনই সংবাদ দিল

ডেপুটি কমিশনারকে। তিনি তখন মাচায় এসে বসলেন এবং হুকুম দিলেন, বাঘকে তাড়িয়ে আমার সামনে আনো। আহত বাঘকে তাড়িয়ে আনা যে কত অসাধ্য এবং কী ভয়াবহ তা' তিনি চিন্তা ক'রে দেখলেন না। সকলে ভয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলো। গোকুল সিং ছিল ধীর স্থির, এবং সে যে কাজে একবার হাত দিত সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিরত হ'ত না। যেখান থেকে বাঘের গর্জন শেষ শোনা গিয়েছিল, সে সন্তর্পণে সেইদিকে এগিয়ে চল'ল। ইত্যবসরে বাঘ যেখানে ছিল সেখান থেকে উঠে লুকিয়ে এগিয়ে এসে এক ঝোপের পাশে কখন যে বসে ছিল, কেউ তা' জানতেও পারেনি। যেখান থেকে সে শেষ গর্জন করেছিল সে জায়গা খানিকটা দূরে, এই বিশ্বাসেই গোকুল এগিয়ে চল'ল।

সুযোগ বুঝে বাঘ হঠাৎ কাছের এক ঝোপ থেকে অতর্কিতে গর্জন করে গোকুলকে আক্রমণ কর'ল এবং এক কামড়েই তার জঙ্ঘার হাড় গুঁড়া করে তাকে পেড়ে ফেলে উপরে চেপে বস'ল। চারিদিকে সন্ত্রাসের সাড়া প'ড়ে গেল। সাথারা যে যেখানে ছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো, কেউ বা মাচার দিকে, কেউ অন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। মাচায় শিকারী এবং মাটিতে হাঁকোয়ারা হতবুদ্ধি হ'য়ে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। প্রতিহিংসার যে ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছে তাতে বাঘের কাছে যাবার কারুরই সহায় হ'ল না। অনেকের মনে হ'ল, গোকুল কি আর বেঁচে আছে!

সকলের মনেই যখন এইরকম ভয় ও দ্বিধা, তখন এগিয়ে এলো গঙ্গা। গঙ্গা বহুদিনের পুরানো শিকারী। সে বল'ল "গোকুলকে বাঘে ধ'রে খাবে আমাদের সামনে? আমার জান যায় যাক, তাকে খুজে বা'র করবই।" এই বলে বন্দুক হাতে গঙ্গা এগিয়ে চল'ল, সঙ্গে তার একজন সাহসী যুবকমাত্র।

এ যে কত বড় দুঃসাহসের কাজ তা' সহজে অনুমান করা যায়। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে দুজনে এগিয়ে চল'ল। দৃষ্টিরোধ ক'রে

সামনে ঘন বন রয়েছে, কোথায় যে বাঘ তাও জানা নাই। অথচ বাঘ যে নিজের লুকানো জায়গা থেকে সতর্ক লক্ষ্য রাখছে, সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। অতি সাবধানে নিঃশব্দে দুজনে এগিয়ে চললো। অসমতল কাঁকুরে জমি, চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গলে সমাকীর্ণ, এক পা এগোয়, চারিদিক দেখে নেয় আবার এগোয়, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। যুবকটি মাঝে মাঝে নিঃশব্দে গাছে উঠে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখে, কোথাও হতভাগ্য গোকুলের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা! উদ্‌গ্রীব হয়ে সংবাদের আশায় গঙ্গা তার দিকে চেয়ে থাকে! কিন্তু নিঃশব্দে যুবকটি আবার নেমে আসে, দুজনে নতুন পথে অন্বেষণের পালা শুরু করে। এমনি ভাবে অরণ্যের গলি ঘুঁজি খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় গাছের উপর মাথা তুলতেই দেখে, খানিক দূরেই গোকুল চিৎ হয়ে পড়ে আছে, তখনও সে জীবিত, আহত বাঘ তার জংঘার উপরে বসে। বাঘের দৃষ্টিতে যাতে না পড়ে তাই অতি আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে ইঙ্গিত কর'ল সে গঙ্গাকে যে, সেখান থেকে দেখা যায়। গঙ্গা তার বন্দুকটি পিঠে বেঁধে নিঃশব্দে খুব সন্তর্পণে উঠে গেল গাছে। বিড়াল যেমন করে ইঁদুরকে খেলিয়ে তারপর মারে, প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রুদ্ধ বাঘও তেমনি করে তিলে তিলে তাকে শেষ করছে। তার যে অঙ্গ একটু নড়ে অমনি সেটা কামড়ে ভেঙে দেয়। বেদনার্ত গোকুল হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে খুঁজছে, কোথাও কেউই কি তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না। বাঁচবে না সে হয়তো, কিন্তু তার এই নৃশংস পরিণামের প্রতিকার করবার কেউই কি নেই? আসন্ন মৃত্যুর দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে শুয়ে তার হয়তো বা মনে পড়ছে তার ছোট্ট কুটিরখানি, তার স্ত্রী ও সন্তানদের মুখ। সহসা গঙ্গার সঙ্গে তার চোখাচোখি হতে যেন একটু আশ্বাস পেল। তার সমস্ত প্রাণ যেন তখন অক্ষত চোখ দুটির দৃষ্টির ভিতর দিয়ে জ্বলজ্বল করছে। এতদিনের সাথীর এই অবস্থা দেখে গঙ্গার বুক ফেটে যেতে লাগল, কিন্তু গঙ্গা তখন নিরুপায়। বাঘ এমন-

ভাবে চেপে বসে যে, তাকে গুলি করতে গেলে গুলি গোকুলেরও লাগবে এবং যেটুকু বা আশা আছে, বন্ধুর গুলিতে তাও হবে শেষ। সময়ের গতি গেছে থেমে, পর মুহূর্ত যেন স্থির হয়ে গেছে। অপেক্ষা করে রইল গঙ্গা। একবার ওকে ছেড়ে বাঘ একটু মাথা সরাতেই তার কানের পিছন দিক লক্ষ্য করে অগ্নিবর্ষণ করল গঙ্গার বন্দুক, সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ল বাঘের দেহ। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোকুলের মুখ, ছিন্ন মেঘেব ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলোর শেষ হাসির মত। "বাঃ, ভাই গঙ্গা সাবাস! অব হমারা জান যায় তো ভী কোই হরজ নহী।" সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করে যেন এই কটি কথা বলবার অপেক্ষায় সে ছিল। সাংঘাতিকভাবে আহত রক্তাক্ত তার দেহ চেতনাহীন ও নিস্পন্দ হয়ে গেল। এই তার শেষ কথা।

এগার

আদমখোর বাঘ

তখনকার আমলের গভর্ণর মানে রাজপ্রতিনিধি। তিনি এসেছেন শিকারে, জেলার সম্মানিত অতিথি তিনি। তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা শিকারে এসেছেন, আয়োজন তাঁদেরই জন্য। এ শিকারের আয়োজনের বিশেষ ভার জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপরে ন্যস্ত, তিনিই সর্বেসর্বা। খাসমহলে নবাগত এবং কোন হিসাবেই তাঁদের সমকক্ষ না হয়ে অনিমন্ত্রিত আমি যে সেদিন বাঘ মারলাম তাতে কানে এলো, কাজটা যেন সকলের অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে এবং একটু যেন অপ্রসন্নও হয়েছেন, বিশেষতঃ পুলিশের কর্তৃপক্ষ। নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে তিন-চার দিন আর শিকারে গেলাম না। এমন সময় চীফ সেক্রেটারী মিঃ ম্যাক্‌ফার্সন একদিন দেখা হতেই আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি শিকারে আস না যে?" তাঁকে আমার মনের ভাব বলায় তিনি বললেন যে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কোন অশোভনতাই নেই আমার শিকার করায় এবং কেউ এতে অসন্তুষ্ট নন, অন্ততঃ স্যার এডোয়ার্ড গেট তো নয়ই।

সারা রাত ধরে চলেছে ঝড়ের মাতামাতি ও ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি। ভোর হতেই কেড়ের শিকারী শিউধারী সিং এসে খবর দিল যে সেই আদমখোর বাঘ কাল রাত্রে এসে মোষ মেরেছে, বাঁকা রায়ের জঙ্গলে। 'আদমখোর' বাঘ মানে 'মনুষখেকো বাঘ' বা 'ম্যান ইটার'। এই বাঘটাকে মারবার আশাতেই দুদিন আগে গভর্ণরের দল গিয়েছিলেন, হাঁকোয়া করা হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে সন্দেহ হওয়ায় বাঘ আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল, তাকে আর সেদিন পাওয়া যায়নি। স্যার এডোয়ার্ড গেটের নিয়ম ছিল, রবিবারে তিনি শিকারে যেতেন না এবং তিনি যেতেন না বলে অন্য কেহই বাঘ শিকারে

যেতেন না, সেদিনটা শিকার বন্ধ থাকতো। আদমখোর বাঘের খবর যেদিন পেলাম, হ'বি ত হ' সেদিন রবিবার। অথচ এমন শিকারের খবর, কি করব কিছুক্ষণ চিন্তা করে চলে গেলাম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবুতে এবং তাঁকে সব বললাম।

কায়দা ছিল, সকলে সব শিকারের সংবাদ সংগ্রহ করে, কার্যসূচী প্রস্তুত করে, গভর্ণরের প্রাতরাশের টেবিলে উপস্থিত করতেন এস পি এবং সেই অনুসারে শিকার হত। সেদিন সকালে এস-পি বলেছেন "আজ আর কোন মোষ মাবার খবর নেই।" এমন সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবী বল্লেন, "হ্যাঁ আজ সেই ম্যান ইটার মোষ মেরেছে।" "তুমি কি করে জানলে?" প্রশ্ন করেন এস-পি। "কেন, আমার খাসমহল অফিসার বিজয় বলল যে। সে শিকারীদের কাছে শুনেছে," উত্তর দেন মিঃ কিলবী। এস-পি মিঃ টেনেয়ারের লাল মুখ আরো লাল হয়ে ওঠে, হেঁকে ওঠেন তিনি, "শিকারের আয়োজন-কর্তা আমি, না বিজয় সেন? সেই যদি এত খবর রাখে তো সেই শিকার পরিচালনা করুক। আমি এতে নেই।"

পাহাড় ঘেরা পালামৌর একটি উঁচু টিলার উপর কেড়ের ডাকবাঙ্গলা। পিছনে ও ডানদিকে সু-উচ্চ শালের বন। বাঙ্গলার বাঁদিকে ঘন ছায়াসমন্বিত একটি বহেড়া গাছ। সামনের ঢালুর ডান দিকে একটি স্বতঃস্ফূর্ত উৎস ধারা চারদিকে কাঠের টুকরো দিয়ে চৌকোনা করে বাঁধান। সেখানে অদূরের গ্রাম থেকে গ্রাম্যবধুরা আসে তাদের মাটি বা তামার পাত্র বাসন ভরে নিতে। ধাপে ধাপে নেমে গেছে শস্য ক্ষেত, যেন আসন বিছিয়ে দিয়েছে দূর-দিগন্তের ধ্যানমগ্ন পর্বতমালার চরণপ্রান্তে। উৎসের জলধারা এক ক্ষেত থেকে অপর ক্ষেতে জলের সেচ দিয়ে নদী হয়ে বয়ে গেছে। বাঙ্গলাতে প্রাতরাশ শেষ ক'রে সকলে এসে সমবেত হয়েছে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সকলেই শিকার সম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্যাপৃত। মিঃ কিলবী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত হতেই

তিনি আমাকে একটু আলাদা ডেকে বললেন—"শোন বিজয়, তুমি ভীষণ অন্যায় করেছো। আজ রবিবার, আজ গভর্ণর শিকার করেন না—আজ তুমি খবব দিয়েছ। তা ছাড়া এস-পি সব বন্দোবস্ত করে থাকেন, তাঁকে জানান হয়নি, তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, নানা কথা বলছেন, ইত্যাদি।"

"আমার অন্যায়টা কোন্‌খানে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "জঙ্গল খাসমহলের, শিকারী খাসমহলের, সমস্ত খাসমহলের। আমি খবর

পেয়েছি, আপনি আমার উপরওয়ালা, আপনাকে বলেছি। অনুচিত মনে করলে আপনি কথাটা নাই বলতেন। আপনি আমার উপরওয়ালা, আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, এস-পির সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই। বলায় অন্যায় হয়ে থাকলে সেটা আপনার, আমার নয়।" কাছেই ছিলেন মিঃ ম্যাকফার্সান, আমার উষ্মা দেখে এগিয়ে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার! "আপনিই বলুন তো" করে আরম্ভ করে তাঁকে বললাম সব। তিনি হেসে বললেন "তুমি চুপচাপ থাক, আমি সব শান্ত করে দিচ্ছি।"

আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ম্লান দিবালোকে বিক্ষিপ্ত মনে আমার তাঁবুর ভিতরে বসে আছি, মিঃ কিলবীর আর্দালী দূরে এসে দরজায় দাঁড়াল—"হুজুর, সাহেব সেলাম দিয়েছেন।" অপ্রসন্ন মনে গেলাম তাঁর তাঁবুতে। তিনি বললেন, "শোন, গভর্ণর বলেছেন ম্যান ইটারের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তখন ওকে শেষ করাই ঠিক। তিনি যাবেন না, অন্য সকলে যান। কিন্তু অন্য কেউও যাবেন না। পায়ে হেঁটে গিয়ে খুঁজে বাঘের সামনা-সামনি হয়ে মারবার সাহস আছে?" বললাম "সে সাহস আছে বৈকি এবং আমি স্থির জানি বাঘ ঐখানেই আছে।" "তাহলে চল, আমরা হেঁটে তার সামনে যাই ও শেষ করি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে শিকারের সাজ-পোষাকে সজ্জিত হয়ে বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে চললেন মিঃ কিলবী, সিউধারী সিং ও আরেকজন স্থানীয় লোক। বৃষ্টিতে পিছল পথে কখনও পা হড়কে যায় চড়াই উঠতে, কখনও বা পাথর স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে উৎরাইয়ের মুখে পায়ের ধাক্কায়। বনের পাতায় পাতায় টপ্ টপ্ ক'রে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ ছাড়া চারিদিক নিঃশব্দ। শন্ শন্ করে মাঝে মাঝে কন্‌কনে হাড়ে কাঁপুনি ধরান হাওয়া দিচ্ছে। একটি পার্বত্য নদী বা 'সোতী' সাদা-বালিতে রেখা এঁকে চলে গেছে, কোথাও বা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে, কোথাও বা গাছের পাদমূল

অভিষিক্ত করে, কোথাও বা ছোট ছোট নুড়ির মেলা বিছিয়ে দিয়ে। আমাদের ডানদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটি জলরেখা নেমে এসে মিলেছে সেই সোতীতে। এখন অবশ্য উভয়েই জলহীন শুষ্ক, মাঝে মাঝে ঘাস গজিয়েছে। এই সোতীর মাঝে একটি অর্জুন বা মহুয়া গাছ, বর্ষার সোতী তার গোড়ার মাটি ধুয়ে শিকড়গুলি দৃশ্যমান করে দিয়েছে। তারই একটি শিকড়ে বাঁধা ছিল মহিষটি, প্রবল পরাক্রমে যার থেকে বিছিন্ন করে বাঘ তাকে নিয়ে গেছে। ভিজে বালিতে রেখে গেছে তার মস্ত পায়ের ছাপ, দেখে বুঝলাম এ পুরুষ বাঘ, বাঘিনী নয়। মিঃ কিলবী বললেন, "আমি পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তুমি চারিদিকে নজর রাখ। জন্তু-জানোয়াব দেখলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেও। ওদের এমন স্বভাব যে, নড়াচড়া না কবলে হয়তো তোমার পাশ দিয়ে চলে যাবে তোমাকে লক্ষ্য কববে না। এই যে আমার কালো ওভারকোট দেখছ এটা পরে একদিন এক বুনো শূয়োরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলাম। গুলি করে শূয়োর মারা হেয়-জ্ঞানে আমিও তাকে মারলাম না, সেও পাশ দিয়ে চলে গেল, আমার নিশ্চল দেহ লক্ষ্য না কবে।"

এক জায়গায় ঘাসের ভাঙ্গা অবনমিত চেহারা সারিবদ্ধভাবে দেখে বুঝলাম, এইখান দিয়ে মোষের স্থুল দেহ টেনে নিয়ে গেছে। এ চিহ্নকে ওদেশের লোকেরা বলে 'ঘিসিয়ারী' অর্থাৎ টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন। ঘিসিয়ারীটি সেই পাহাড়ের গায়ের নালাটিতে নেমে গেছে। তাই অনুসরণ করে চলেছি, একটু দূরে গিয়েই দেখি কিছু দূরে একটি গাছের নীচু ডালে কতকগুলি শকুন বসে, যেন উন্মুখ হয়ে কিসের প্রতীক্ষায়। বুঝলাম, ওখানেই বাঘের 'রহান' মানে থাকবার ও বিচরণের জায়গা। ওখানেই সে তার শিকার করা মোষ নিয়ে আছে ও বসে খাচ্ছে এবং অবশিষ্টাংশের প্রসাদার্থী হয়ে বসে আছে শকুনেরা। মিঃ কিলবীর টুপিতে হাত দিতেই তিনি আমার দিকে তাকালেন, তাঁকে ইসারায় পাখীদের দেখালাম, তিনিও ইসারায়

প্রত্যুত্তর দিলেন, "দেখেছি"। একটু এগিয়েই দেখি সোতীর ছুধারে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে মাচার সারি। এবার বুঝলাম কেন সেদিন হাঁকোয়াতে এ বাঘকে পাওয়া যায়নি। রহানের এতো কাছে মাচা হলে বাঘকে পাওয়া অসম্ভব, কারণ লোকজনের প্রথম সাড়াতেই সে বিরক্ত হয়ে দূরে চলে যাবে। মিঃ কিলবীর সঙ্গে আলোচনা হয়ে ঠিক হল যে, নতুন মাচা তৈরির তখন সময়ও নেই, সম্ভবও নয়, কাজেই কাঁচা বাঁশের কয়েকঠি মই কোনমতে তৈরি করিয়ে নিয়ে সুবিধামত গাছে ঠেস দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে বাঘের হাঁকোয়া হবে। আমরা উভযে ফিবে গেলাম এবং তাড়াতাড়ি সিঁড়ি তৈরি করিয়ে ফিরে গেলাম একা আমি। আগেকার মাচা বেশ কিছু দূরে সোতীর বাঁকের কাছে। যেখানে বাঘ আসবে মনে হল সেখানে একটা বেশ সুবিধামত পলাশ গাছ পেলাম, পাশাপাশি যার কয়েকটি ডাল বেশ ছড়ান তার উপরে সামান্য ছু-চারখানি ডাল ও বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার মাচা হয়ে গেল এবং সেখানে আশ্রয় নিলাম।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে, বেলা তিনটে আন্দাজ হবে। আমার সামনে সোতার উপরে খানিকটা উলুবন। হঠাৎ শুনি মোষের গলার ঘণ্টার শব্দ, চেয়ে দেখি সোতীর উপর দিয়ে প্রকাণ্ড বাঘ মোষের মৃতদেহ হড়্ হড়্ করে টেনে নিয়ে আসছে, কখনও বা বিড়াল যেমন ইঁদুর মুখে করে আনে তেমনি করে তুলে আনছে, আর বাঘেব মুখের গ্রাসেই চিল ছোঁ মারতে আসছে। আমার কাছ থেকে মাত্র ৪০।৫০ গজ দূরে। বাঘ প্রথমে উলুবনে ঢুকে ঘুরে ঘুরে মাড়িয়ে খানিকটা উলুঘাস ভেঙ্গে নিল, তারপর তার উপর মোষের মড়িটা রেখে বুক দিয়ে তার উপর চেপে বসে নিশ্চিন্ত মনে খেতে লাগল। সামনে বাঘ, অত সুবিধামত জায়গায়, একটি গুলিতেই ওকে শেষ করতে পারি। হাতে আমার সজ্জিত বন্দুক, কিন্তু গুলি করছি না কারণ বড়দিনের শিকারে গভর্ণর নিমন্ত্রিত

অতিথি, তাঁকে ফেলে আমি শিকার করব এটা অশোভন, তা ছাড়া সেদিনই সকালে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে অত গোলমাল হয়ে গেছে এই শিকার নিয়ে। ম্যান ইটার বলে তো বাঘের কোন পরিচিতি চিহ্ন নেই, আত্মরক্ষার জন্য মারছি এমনও নয়, তাই আয়ত্তে আসা সত্ত্বেও বাঘকে মারলাম না। গভর্ণর অন্য সকলকে শিকারে যেতে বলেছিল, তাই এস-পি তাঁদের ময়ূর, মুর্গী শিকার করাচ্ছেন দূর থেকে, সেই হাঁকোয়ার অস্পষ্ট কোলাহল এবং বন্দুকের গুলির শব্দ ভেসে আসছে, এদিকে বাঘও বসে পরম তৃপ্তিতে খেয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ ধরে খেলো, তারপর লম্বা হাই তুলে সটান শুয়ে পড়লো।

দূর থেকে সঙ্কেতসূচক একটা শিস শুনলাম, যার মানে "আসবো কি?" দুটি শিসে প্রত্যুত্তর দিলাম "না। বাঘ সামনে।" আবার দুটি শিস "অপেক্ষা করছি।" আস্তে নেমে পিছন দিকের ঘুর পথে গিয়ে যে শিস দিচ্ছিল তার সঙ্গে মিললাম। ফিরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গিয়ে সব বললাম। তিনি বললেন মারলে না কেন, অমন বাগে পেয়ে?" "হ্যাঁ মারি আর আবার তাই নিয়ে হৈ চৈ হোক আর কি।"

পরদিন আবার দূরে এসে সেলাম জানাল। তাঁবুতে যেতেই মিঃ কিলবী বললেন, "এ বাঘ শিকারটার ভার তুমি নাও, গভর্ণর বলেছেন।" প্রজাদের উপর পুলিশের দুর্ব্যবহারে খাসমহলের প্রজারা তাদের শিকার-ব্যবস্থায় বিরক্ত ছিল, তাই ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এবং আমাকে শিকারে উৎসাহী জেনে তাদের উৎসাহও বেড়ে গেল। এবার সব হিসাব করে নতুন করে মাচা বাঁধলাম এবং মোষও বাঁধা সুরু হল। তৃতীয় দিনে সংবাদ এলো, নিঃশঙ্ক বাঘ আবার মোষ মেরেছে। এবার আমি নিজে নিয়ে গিয়ে সকলকে কে কোন্ মাচায় বসবেন সব ঠিক করে দিলাম এবং আমার হিসেবে এবার ভুল হল না। সকলের মাচায় বসা হয়ে

গেলে যারা ষ্টপ্ বা রুক তাদেরও বসা হয়ে গেলে যে হাঁকোয়াদের সংকেত দেয় সে "চলা হো", "চলা হো" করে সঙ্কেত দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাচার সারিকে ধনুকের মত ঘিরে হাঁকোয়ারা কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে সরবে হাঁকোয়া সুরু করল। তার কয়েক মিনিট পরেই সম্ভাবিত পথে বাঘ বেরুল, গুলি হল এবং শোনা গেল বাঘ জখম। এবারও নেমে এগিয়ে গেলাম এবং কয়েক পা অগ্রসর হয়েই দেখি 'আদম খোর' বাঘ তার জীবনলীলা সাঙ্গ করেছে।

সেই বছর থেকে শিকার পরিচালনার ভার পড়ল আমার উপর এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত যতদিন ছোটনাগপুরে কর্মস্থল ছিল, এর থেকে অব্যাহতি পাইনি।

বার

রণ বাহাদুর সিং

১৯১০ সালের নভেম্বরের শেষে কর্মের আহ্বানে বেরিয়ে পড়তে পড়তে হল রাঁচী জেলার পাহাড জঙ্গলের ভিতরে যে সব গ্রাম আছে সেখানে লোন্-কালেক্শানের কাজে—পথে পথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অন্ততঃ একমাস কাটাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে। তার কিছুদিন আগে থেকে রাঁচী জেলার দক্ষিণ প্রান্তে বাসিয়া, কোলেবিরা ও বানো থানা এলাকায় নরখাদক বাঘের ভীষণ উৎপাত দেখা দিয়েছে। উত্যক্ত হয়ে জেলা সরকার প্রথম ৫০৲, তারপর ১০০৲, বাড়তে বাড়তে ক্রমে ১০০০৲ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছেন সেই নরখাদক বাঘটি মারবার জন্য। আমার গন্তব্য পথ এই বাসিয়া কোলেবিরার ভিতর দিয়ে। নব নব জনপদের ভিতর দিয়ে অরণ্যের নিত্য-নূতন পরিচয়, নূতন অভিজ্ঞতায় আমার সঞ্চয়ের পাত্র পূর্ণ করে চলেছি। মনে পড়ে, বাসিয়ার এক অভিনব অভিজ্ঞতার কথা। কাজ শেষে শিকার সম্ভাবনার পরিদর্শন হিসাবে স্থানীয় কয়েকটি যুবকের সঙ্গে বনের ভিতর ঢুকেছি। তারা পথ দেখিয়ে আমায় নিয়ে গেল একটি পাহাড়ের উপর এমন দুর্গম অপ্রশস্ত পথে, যার একদিকে উঠে গেছে সোজা খাড়া পাহাড়ের প্রস্তর প্রাচীর। তারই গায়ে, একজন কোনমতে যেতে পারে এমনি ঝুলন্ত পাথরের উপর দিয়ে পথ। অন্য পাশে শত শত ফুট নীচে শালের বন। একজায়গায় গিয়ে দেখি, সামনে পাহাড়ের একটি ৪ ফুট চওড়া ফাটল মুখ হাঁ করে আছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কানে এলো একটা অস্ফুট গুঞ্জন, সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীরা "ভাগিয়ে হুজুর, জান বাঁচাইয়েগা তো ভাগিয়ে" বলে এক লাফে ফাটলটি পার হয়ে ওপারের গুহায় অদৃশ্য হয়ে গেল। চেয়ে দেখি মস্ত মস্ত দুচারটি

পাহাড়ী মৌমাছি উড়ে আসছে। আমি যে ঝুলন্ত পাথরটির উপরে দাঁড়িয়ে, তার নীচেই তাদের বিশাল মৌচাক। এদের হুলে তীব্র বিষ। যখন এরা দলশুদ্ধ কাউকে আক্রমণ করে, তার প্রাণনাশ করে ছেড়ে দেয়। চেয়ে দেখলাম ফেরবারও পথ নেই, তখন রাইফেল হাতে লাফিয়ে সেই ফাটল পার হয়ে গুহার ভিতর দিয়ে ঘুর পথে কষ্টে ফিরে এলাম।

পরদিন চললাম কোলেবিরার পথে। দুর্গম পথ চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। শুনলাম পথে, মাত্র কয়েক মাইল বনের ভিতরেই আছে বাঘমুহা জলপ্রপাত, সেটা দেখে যাওয়াই স্থির করলাম। দক্ষিণবাহিনী কোয়েল নদী এখানে প্রপাত হয়ে ঝরে পড়েছে। ঘন বন দুপাশে উঠে গেছে, তারই মাঝে কতকগুলি পাথর একটির উপর একটি এমনভাবে সাজানো, দেখলে মনে হয় যেন একটি অতিকায় বাঘ মুখব্যাদান করে রয়েছে। আর এই পাথরগুলির উপর দিয়ে বয়ে আসছে চঞ্চলা কোয়েল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রায় ৩০ ফুট নীচে, দেখলে মনে হয় যেন বাঘের মুখ থেকে প্রপাতের জল পড়ছে। তাই নাম বাঘমুহা।

এগিয়ে চললাম। একটি নালা, তারপরে শালের বন পেরিয়ে কোলেবিরা ইন্সপেকশান বাঙ্গলা, তারপর কোলেবিরা থানা। সেখানে দারোগাজীর সঙ্গে নরখাদক বাঘের ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হল। আমাকে শিকারে উৎসাহী জেনে তিনি বসালেন তাঁর কাছে। গল্প-সল্পের পর স্থির হল পরদিন আমরা একসঙ্গে শিকারে যাব। যে পথে বাসিয়া থেকে কোলেবিরায় এসেছি সেই পথে কোলেবিরার কাছেই লৌহঙ্গা গ্রামে আমরা মিলিত হব।

নির্দিষ্ট সময় গিয়ে দেখি কয়েকজন হাঁকোয়া নিয়ে দারোগা অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। আমাকে সাদরে আহ্বান করলেন এবং সঙ্গে একজনকে বললেন, "এবার যা, শরণাতে পূজো দিয়ে আয়।" "আপনার সঙ্গে ভমর পাহাড়ের জমিদার রণবাহাদুর সিংয়ের পরিচয়

করিয়ে দিই। তিনিও ভাল শিকারী, তাঁর শিকারে মুগ্ধ হয়ে রাঁচীর ডেপুটি কমিশনার এইচ সি ষ্ট্রিটফিল্ড আই-সি-এস, তাঁকে একটি রাইফেল উপহার দেন।" রণবাহাদুর সিংকে সংবাদ পাঠালেন দারোগাজী একজন চৌকিদরেকে দিয়ে। সেদিনই বিকালে এলেন রণ বাহাদুর সিং আলাপ করতে। বলিষ্ঠ গঠন, হাসিখুশী লোকটি খুব ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখের চঞ্চল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যা বহুদূব পর্যন্ত দেখে নেয় একই নজরে। তাঁর গ্রামের নাম ভমর পাহাড়। সেই গ্রামের পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় শতাব্দী ধরে মৌমাছিরা চাক বেঁধেছে, বড় বড় পাহাড়ী মৌমাছি, যাকে ওরা বলে ভমর, গ্রামের নাম সেইজন্য ভমর পাহাড়। নরখাদক বাঘের প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "সত্যিই কি সরকার এক হাজার টাকা দেবে?" একটা বাঘ মারবার জন্য যে অত টাকা দিতে পারে এ যেন তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য এবং তাকে মারা যে তেমন কিছু নয়, তা মনে হয় না। এ অঞ্চলের প্রায় গ্রামেরই প্রান্তে বড় গাছ, সাধারণতঃ শাল গাছকে এরা বনদেবতার আশ্রয় জ্ঞানে পবিত্র মনে করে। সেই একটি বা দুটি বড় গাছ ও তার পাশের কয়েকটি গাছ নিয়ে যে শালবীথি রচিত হয় তাকে এঁরা বলে 'শরণা'। কোন শিকারে যাবার আগে বনদেবতাকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে সেখানে পুজা দেবার রীতি, যাতে যাত্রা সফল হয়। চেঙ্গনা (মুরগী) বা পাঠরু (পাঁঠার বাচ্চা) এবং এক পাত্র তাপওয়ান (মহুয়ার মদ) দিয়ে শরণাতে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। সেদিনও তাই যথারীতি গ্রাম্য পুরোহিত বা পাহান গেলেন পূজো দিতে, আমরা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলাম গাছের ছাওয়ায়। কিছু পরে পাহান ফিরে এসে বললেন "হ্যাঁ শিকার হবে।" তিনি সাফল্য-সূচক কোনও সঙ্কেত পেয়েছেন।

উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে রাজপথ, পশ্চিমে প্রায় এক মাইল ব্যাপী পাহাড়ের ঢালু নেমে এসেছে, পথ পার হয়ে গেছে পূর্বদিগন্তের দিকে। আমরা চললাম দক্ষিণমুখো হয়ে কিছু দূরে দূরে। সামনে

কতকগুলি নালা নেমে গেছে জঙ্গলে ভরা, তার ওপার থেকে হাঁকোয়া করে আসছে। পিছনে ছাড়া ছাড়া জঙ্গল ও খানিকটা বিস্তৃত জায়গা, তার পিছনে জঙ্গলে ভরা পাহাড়।

প্রস্তুত হয়ে আমরা মাটিতে বসে আছি, কি আসে কি আসে অপেক্ষায়। প্রথমে একদল হরিণ চলে গেল দূর দিয়ে, তাদের সমবেত পদধ্বনি পেলাম। তার কিছু পরে শুখ্‌না পাতার উপর খুচ্‌ খাচ্‌ কোন জানোয়ারের পদশব্দ পেলাম, কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পেলাম না। কি জানোয়ার ভাবছি এমন সময় রণবাহাদুর সিংয়ের বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে চেয়ে দেখি একটি আহত ভাল্লুক দৌড়ে পালাচ্ছে এবং তার পিছনে বন্দুক হাতে ছুটছেন রণবাহাদুর সিং। সঙ্গের লোকজনদের তিনি চিৎকার করে বললেন, আমরা যেখানে বসেছিলাম তার পিছনের পাহাড়ের যে গুহাতে ওর ঘর, সেদিককার পথ-রোধ করতে। তারা তাই করল। আহত ভাল্লুক তার গন্তব্যপথে বাধা পেয়ে রাস্তা পার হয়ে ওপারে গেল, তখনও তার রক্ত ঝরছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালো রণবাহাদুরের গুলিতে।

কাজের তাড়ায় কোলেবিরা ছেড়ে যেতে হল সেদিনই। নর-খাদক বাঘকে মারবার জন্য সময় আর করে উঠতে পারলাম না। তারপর অবশ্য কেউ আর মারে না দেখে ডব্লিউ বি টমসন আই-সি-এস, তখনকার রাঁচী জেলার ডেপুটি কমিশনার বাঘ মারবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বানোতে দশদিনের জন্য ক্যাম্প করলেন। চারি-পাশে হুকুম দিলেন, বাঘে মানুষ ধরেছে খবর পেলেই তাঁকে জানাতে। এক দিন খবর এলো গ্রামের কতকগুলি মেয়ে ধান কাটছিল, তাদের একজনকে বাঘে মেরেছে। জানতে পেরেই প্রায় এক হাজার গ্রামবাসী সেই ক্ষেতের কাছে জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে এবং মিঃ টমসনকে খবর দিয়েছে। তখনই প্রস্তুত হয়ে গেলেন মিঃ টমসন এবং তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এলো রোগা মরাঞ্চে এক বাঘ। তাকে শেষ করলেন মিঃ টমসন। তারপর তিন মাসের

মধ্যে আর বাঘের কোন উপদ্রবের খবর পাওয়া গেল না দেখে তিনি সরকারী তহবিল থেকে হাজার টাকা তুলে গ্রামবাসীদের ও যাদের আত্মীয়দের বাঘে মেরেছে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

১৯১০ সাল শেষ হয়ে গেল, তারপর কেটে গেল অনেক বছর। ছোটনাগপুরের অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে কর্মজীবন যাপনের পর ১৯৩০ সালে রাঁচী বদলী হয়েই একদিন বেরিয়ে পড়লাম ভমর পাহাড়ের পথে রণবাহাদুর সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। মাঝের গতিশীল কয়েকটি বছর কতো পরিবর্তনই এনে দিয়েছে পরিচিত সেই জঙ্গলে, বনের পথে, যে পথ সেদিন অতিক্রম করেছি বাইসিক্লে কতো পরিশ্রমে, আজ অনায়াসে মোটরে চলেছি। দেখা হল রণবাহাদুরের সঙ্গে, আন্তরিকতায় ভরা হাসিটি নিয়ে অভ্যর্থনা করলেন তিনি। দেখলাম সেই উৎসাহ, সেই উদ্যমপূর্ণ মন আজো আছে, তাঁর দেহ কেবল তার সঙ্গে সমতা রেখে চলার ক্ষমতা হারিয়েছে। মন চির নবীন কিন্তু দেহে এসেছে জরার শিথিলতা। জীবন প্রভাতের সহ-শিকারী বন্ধুকে সেই শেষ অভিবাদন জানিয়ে এলাম। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

ন্তের

রাজা রায়বাহাদুর উদ্ধবচন্দ্র সিং

শিকারে যাদের সঙ্গে আমার প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছিল সেই বন্ধুদের যখন স্মরণ করি মনে পড়ে এক এক জনের এক এক বৈশিষ্ট্যের কথা। বীর কিশোর সিং, ফ্রাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়েল, এঁরা ছিলেন অসীম দুঃসাহসী এবং প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ; কিন্তু অভ্রান্ত লক্ষ্য দেখেছি ঝালদার রাজ্য উদ্ধবচন্দ্রের এবং প্রায় তাঁর কাছাকাছি স্যার লরী হ্যামণ্ডের।

আমার শিকারের প্রকৃত গুরু উদ্ধবচন্দ্র। ১৯১০ সালে কাকামণির কাছে পুরুলিয়াতে গেছি আমাদের বাড়িতে, কাকামণি তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। উদ্ধবচন্দ্র বয়সে আমার চেয়ে সামান্য কয়েক বছরের মাত্র বড় ছিলেন, আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তার মাত্র বছর কয়েক আগে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ থেকে তিনি নিজের রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও সংযমী, আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিমান, অথচ তাঁর স্বভাবে বা ব্যবহারে কোথাও নম্রতার অভাব ছিল না, উদার ছিল তাঁর হৃদয়। প্রজাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক রাখতেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন ভাল শিকারী। বন্দুক পিস্তলই কি, আর তীর-ধনুক গুলেলই বা কি, তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। নিজে রীতিমত ব্যায়াম চর্চা করতেন। পরবর্তী জীবনে ইনি যোগ্যভ্যাস আরম্ভ করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের (গন্ধবাবা) তিনি ছিলেন প্রিয় শিষ্য। বিশুদ্ধানন্দের কতকগুলি অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শিক্ষা ও সাধনার বলে তার কিছু কিছু আয়ত্তও করেছিলেন।

শিকারের সখ কৈশোর থেকে, কাজেই আমাদের পরিচিতি সৌহার্দ্যে পৌঁছতে দেরি হ'ল না। একসঙ্গে একদিন শিকারের বাসনা জানালাম তাঁকে। ১৯১০ সাল, চাকরির আরম্ভে তখন রাঁচীতে আমার কর্মস্থল। একবাব তিনি খবব পাঠালেন যে, অম্বু-বাচির ক'দিন প্রজারা চাষের কাজ কবে না সেই সময় শিকারের নিমন্ত্রণ জানালেন আমাকে ও আমার সহকর্মী বন্ধু মহম্মদ হামিদকে।

তখনকার দিনে যান-বাহনের এতো সুবিধা ছিল না, কাজেই রেল পথে ঝালদা রওনা হলাম। মানভুম জেলার অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার লাগা ক্ষুদ্র রাজ্য ঝালদা। এখানকার তৈবি ইস্পাত প্রসিদ্ধ। এইখানকার পার্বত্য নদীব মধ্যে লৌহ মিশ্রিত কালো বালি গলানো লোহা থেকে তৈরি হয় তলোয়ার, ছোরা, ছুরি, তীবেব ফলক, ঝাঁতি ইত্যাদি। ঝালদার রাজা কাকামণিকে একখানা তলোযাব দিয়ে-ছিলেন, তার ধার দেখিয়েছিলেন, এক কোপে আঁশশুদ্ধ একটা বড় রুইমাছ লম্বালম্বি কেটে এবং একটা পাৎলা মলমলেব কাপড় দুদিকে

গেরো বেঁধে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে তরোয়ালের এক সঞ্চালনে তাকে দু-টুকরো করে।

স্টেশনে উদ্ধবচন্দ্র স্বয়ং আমাদের নিতে এলেন এবং খুব যত্নের সঙ্গে আতিথেয়তা করলেন। পরদিন আমরা রওনা হলাম গাঁতা গ্রামের উপকণ্ঠে তাঁর যে সংরক্ষিত বন তারই উদ্দেশ্যে। হাজারিবাগ জেলার সংলগ্ন গোলার কাছে গাঁতার ঘন জঙ্গল। সেখানে প্রায় ৩০০।৩৫০ হরিণ থাকতো, গ্রামে এলেই তাড়া খেতো এবং সেই বনে গিয়ে আশ্রয় নিতো। ঝালদা রাজার অত্যন্ত নিকট বন্ধু-বান্ধব কেউ শিকারে এলে তাঁদের নিয়ে যেতেন সেখানে, তাঁরা ২।১টি হরিণ শিকার করতেন, এ ছাড়া সে বনে শিকার প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে হাজারিবাগের পাহাড় জঙ্গল থেকে বাঘ আসতো হরিণের লোভে এবং তখন তিনি খবর পেলেই গিয়ে সে বাঘটিকে শিকার করতেন। এই বনে তাঁর বাঘ শিকারের অসাধারণ কাহিনী শুনেই প্রথম আমি আকৃষ্ট হই তাঁর প্রতি।

একবার বাঘে মোষ মেরেছে খবর পেয়েই রাজা বাহাদুর সেখানে যান এবং লোকজনদের বলেন গাছের ডালপালা দিয়ে মড়িটা ঢাকা দিয়ে সেখানে পাহারায় থাকতে যাতে শকুন-শেয়ালে মুখ না দেয় এবং বাঘ এসে খানিকটা খেয়ে না যায়। তাহলে ক্ষুধার্ত বাঘের আবার ফিরে আসবার স্থির সম্ভাবনা থাকে। সেটা কৃষ্ণপক্ষে। সে যুগে টর্চ ছিল না তবে তাঁব ইলেকট্রিক ব্যাটারি ছিল। ব্যাটারির সঙ্গে তার দিয়ে একটি আলো যে-গাছের নীচে মোষের মড়িটি পড়ে আছে তার উপর ঝুলিয়ে দেন এবং মড়ি থেকে মাত্র ৮।৯ হাত দূরে একটা ছোট ঝোপে বসেন ব্যাটারির সুইচ্ পায়ের কাছে নিয়ে। পাশে থাকে একখানা তলোয়ার ও সজ্জিত বন্দুক। ক্রমে রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। চারিদিক নিস্তব্ধ দেখে বাঘ আসে তার শিকারের কাছে এবং নিশ্চিন্ত মনে যেই সুরু করে তার শিকার খেতে, রাজা বাহাদুর টিপে দেন সুইচ্ পা দিয়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোয়

চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাঘ মুখ তুলতেই বন্দুকের গুলি তাকে বিদ্ধ করে এবং লুটিয়ে পড়ে তার দেহ।

পরে তিনি আমাকে বলেন যে, অতো কাছে বসার কয়েকটি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ বাঘ অত কাছে কিছু সন্দেহ করে না। দ্বিতীয়তঃ বৈদ্যুতিক আলোর গণ্ডী সীমা পার হবার আগেই বাঘকে মেরে ফেলা সহজ হয়। তৃতীয়তঃ লক্ষ্য ভুল হবার সম্ভাবনা কম। চতুর্থতঃ আমরা জন্তু জানোয়ারকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত সেইভাবে দেখে তাকে নিশানা করতে পারা যায়, মাচা থেকে তার সুবিধা হয় না। তিনি বারবার বলতেন, কখনও সঙ্গে অজানা কাউকে নিতে নেই, কারণ তার প্রাণের দায়িত্ব নিতে হয় এও যেমন, অতর্কিতে তার কোন সাড়া শব্দে বাঘ পালিয়ে যেতে পারে এও তেমনই।

আমরা তিনজন, রাজা বাহাদুর, মৌলবী হামিদ এবং আমি গাঁতা গ্রামে গিয়ে পেঁছিলাম। গ্রামের শেষে রাজা বাহাদুরের ভাণ্ডার। সেখানে ক্ষেতের ফসলও যেমন সঞ্চিত থাকে তেমনি থাকে গ্রামের গরু ছাগল। সেই ভাণ্ডারের কাছে গিয়ে দেখি কয়েকজন প্রজা অপেক্ষা করে আছে, যারা আমাদের শিকার করাবে। তারা হরিণের তিন-চারটি দলের খবর দিল যে, অমুক অমুক জায়গায় আছে। এ জঙ্গলের প্রতিটি ইঞ্চি রাজা বাহাদুরের পরিচিত। আমরা বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। অসমতল পার্বত্য বন। একটি পাহাড়ের গায়ে খানিকটা উঁচু জায়গায় বসলেন বন্ধু হামিদ, তার কিছুদূরে নীচে বসলাম আমি এবং আরো অল্প দূরে রাজা বাহাদুর। বন্দুকের শব্দে চেয়ে দেখি একপাল হরিণ দৌড়ে পালাচ্ছে। তারা হামিদের সামনে ছিল, তিনি গুলি করেছেন দুটো, দুটোর একটাও লাগেনি, শব্দে সচকিত হয়ে হরিণেরা পালাচ্ছে। দ্রুত পলায়মান হরিণে গুলি করলাম, লাগল না। শিকার আর হল না দেখে উঠে গেলাম রাজা বাহাদুরের কাছে। দেখি তিনি বন্দুক আনেননি, সঙ্গে শুধু একটি মজার পিস্তল। কেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, হরিণ শিকারের

পক্ষে এই যথেষ্ট। বেশ নিশানা হয়। আমরা বললাম, "দেখান না আমাদের একটু, নিশানা কেমন হয় এতে।" তিনি সানন্দে রাজি হয়ে জানতে চাইলেন কিসে গুলি করবেন। দেখলাম প্রায় ৩০ গজ দূরে একটা খেজুর গাছ বেয়ে উঠছে একটা কাঁকলাস, বললাম এমন-ভাবে ওকে মারুন যাতে ঠিক সামনের দুপায়ের নীচে লাগবে, পেট বা পিঠ কাটবে না। তিনি দু-চোখ খুলেই লক্ষ্য স্থির করলেন ও গুলি করলেন। কাঁকলাসটি পড়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখলাম ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে লেগেছে গুলি। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তাঁর অভ্রান্ত নিশানা দেখে। তারপর অবশ্য উড়ন্ত পাখী তীর দিয়ে বা গুলেল দিয়ে যেভাবে শিকার করতে দেখেছি তাও অদ্ভুত। দুচোখ খুলে নিশানা কবার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন যে চোখ দিয়ে লক্ষ্য করেন তখন সমস্ত ধ্যান সেই চোখেই দেন, কাজেই অন্য চোখটি খোলা থাকলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

শিকারের প্রাথমিক নিয়ম-কানুন ও শিক্ষণীয় যা তা তাঁব কাছেই শিখি এবং তাই যখনি কোন বড় বা দুরূহ কোন শিকারে সফল হয়েছি তাঁকে জানিয়েছি। তিনিও যখনই কোন আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছেন কখনও আমার পরামর্শ না নিয়ে কেনেননি।

কালের প্রবাহে পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে চলতে ক্রমে বাইরের যোগসূত্র আমাদের শিথিল হয়ে এসেছিল। আজ কিছুদিন হল তিনি দিব্যধামে চলে গেছেন, শেষ বিদায়ের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, কিন্তু অন্তরের দিকে যখনই তাকাই দেখি সেখানে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্মৃতি অম্লান হয়ে আজও বিদ্যমান।

চৌদ্দ

বার বার তিন বার

১৯২৫ সাল, গ্রীষ্মকাল। আমার কর্মস্থল তখন হাজারিবাগে। একদিন সন্ধ্যার পর ডেপুটি কমিশনার মিঃ মার্ফি আমার বাড়ি এলেন এবং সক্ষোভে বললেন, "আমার বন্দুকের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত বিজয়বাবু" (**The gun licence ought to be cancelled, Bijoy Babu.**)।

"কেন কি হল ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

"জীবনের সবচেয়ে ভাল সুবিধা পেয়েও মানুষ-ধরা সেই বাঘ আজ বেঁচে গেল।" পরে বিস্তারিত যা বললেন তা এই রকম। সেইদিন সকাল আটটায় বড়কাগাঁও-এর পথে আঠ মাইল দূরে ওদোরনার জঙ্গলে মিঃ মার্ফি সদলবলে শিকারে যান। ছোট হরিণ, মুরগী, ইত্যাদির মেশানো হাঁকোয়াতে যা বেরোয় তাই শিকার করার উদ্দেশ্য। রাস্তার উত্তর দিকে বনে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি লোক দেখে জঙ্গলের মধ্যে একটু খোলা জায়গায় দুই তিনটি বড় শাল গাছ, তার ছায়াতে একটি বড় বাঘ শুয়ে। তাই দেখে মনে হল, হয় মরা বাঘ নয়তো ঘুমুচ্ছে।

দেখেই তো ভয়ে তার বুক শুকিয়ে গেল। সে তখনই নিঃশব্দে পা টিপে টিপে পেছিয়ে এসেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে মিঃ মার্ফির প্রধান শিকারীকে খবর দিল। সে জানতো যে মিঃ মার্ফি এখানে শিকারে এসেছেন।

"অবস্থা শোচনীয় আরও এই জন্য" বলে চললেন মিঃ মার্ফি যে, "আমরা যে তিন-চার জন এক সঙ্গে শিকার করছিলাম, তাদের মধ্যে বাঘের সংবাদ পেয়েই লটারি হয় যে, বাঘকে কে মারতে যাবে এবং তাতে আমার ভাগ্যেই বাঘ শিকারের পালা পড়ে। কিছুদিন থেকে

সেই টোড়ীর নরখাদক বাঘ এই দিকেই আসছিল। গরমকালটা সে আসপাশেই কাটায়। এখানকার লোকেদের বিশ্বাস এইটাই সেই বাঘ। অথচ আমার নিশানা এতই ভুল হ'ল যে ঘুমন্ত বাঘ—a perfect sitter—কে গুলি করতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম! বন্দুক রাখবার আমি যোগ্য নই।'

তিনি খুবই অনুশোচনা করতে লাগলেন। আমি বললাম, "আপনার অবস্থায় অনেকেই ঐ ভুল কর'ত।"

"কেন?"

"আপনি সংবাদ পেয়েই সেখান থেকেই নিশ্চয় রাইফেলে গুলি ভরে কাঁধে বা হাতে নিয়ে হেঁটে গেছেন।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি হাতে করেই নিয়ে গেছি প্রস্তুত হয়ে।"

"এবং পকেটে নিশ্চয়ই বেশি গুলি কয়েকটি নিয়ে হেঁটে অন্ততঃ এক মাইল গেছেন সেখান থেকে।"

"বরং কিছু বেশিই হবে, কারণ আমার হেঁটে যেতে কুড়ি মিনিট সময় লেগেছিল, আর বেশ দ্রুতই চলেছিলাম।"

"আপনি এখনও যে রকম উত্তেজিত হচ্ছেন সেকথা বলতে গিয়ে, তাতে আমি আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে সংবাদ পেয়েই খুব উত্তেজিত হয়েছেন, তারপর আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, লটারিতে বাঘ মারবার ভার পেয়ে সে উত্তেজনা তীব্র হতে তীব্রতর হয়েছে। গিয়ে পৌঁছানর আগেই বাঘ পালিয়ে না যায় এই আশঙ্কাও মনকে অস্থির করে তুলেছিল। বাঘকে দেখামাত্রই গুলি করেছেন।"

"এ সমস্তই সত্যি কিন্তু যে লোকটি বাঘের সংবাদ এনেছিল এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তাকে অনেক দূর পিছনে রেখে অতি সাবধানে এগিয়ে চললাম। কোনও কোনও জায়গায় নিচু হয়ে মাটি থেকে শুকনো পাতা সরিয়ে দিয়েছি, যাতে পায়ের চাপ পড়লে খচ্ মচ্ শব্দ না হয়। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে

গিয়ে দেখি বনের ভিতর একটি পরিষ্কার জায়গা। তার মাঝে দু-তিনটি শাল গাছ, তারই ছায়ায় শুয়ে মস্ত বাঘ। আমি খুব সাবধানে ঘুরে বাঘের পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে গিয়ে গুলি করি।"

"সবই ঠিক কিন্তু আপনি ভুল করছেন বন্দুক ভরে নিয়ে, যে জন্য আপনি সঙ্গের লোকটির কাছে আপনার বন্দুক ভরসা করে বয়ে নিয়ে যেতে দিতে পারেননি। বন্দুকে গুলি ভরতে হয়ত আধ সেকেণ্ড নেয়, বাঘ দেখার পরও সে সময়টুকু পেতেন। ঐ ভারি ডি বি রাইফেল বয়ে অতদূর যেতে হাত আপনার ক্লান্ত হয়েছে, তাই বন্দুকের ঘোড়া টেপ্‌বার সময় চোখ ও মনের সামঞ্জস্য হারিয়েছিল। তাবপর এই গেল, এই গেল, করে দম নেবাব অপেক্ষা না করে নিঃশ্বাসের সমতা আসবার আগেই গুলি করেছেন। এ অবস্থায় নিশানা শতকবা নব্বই জনেরই ভুল হয়। যদি সব সত্বেও বন্দুক পাশে রেখে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হলে গুলি করতেন তবে ঠিক হ'ত। বাঘ যদি তখন কোন কারণে জেগে উঠে পড়ত তাতেও ক্ষতি ছিল না, লক্ষ্য করবার বড় টারগেট পেতেন, তা ছাড়া নিশানা ও গুলি ছুঁড়তে লাগ'ত হয়ত এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ। ততক্ষণ বাঘ চলতে শুরু করলেও নিশ্চিত তার মৃত্যু।"

মিঃ মার্ফি অনুশোচনায় হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়লেন। তাঁকে অনেক বোঝালাম। এও বললাম যে উত্তেজনা বর্জন করে মনের ধৈর্য যত দিন না অভ্যাস হয় ততদিন শিকারে নানারকম হিসাবের ভুল ও বিফলতা আসে। পরিশেষে বললাম, "লটারিতে যখন ওই নরখাদক আপনার শিকার হয়েছে তখন নিয়তি ওর মৃত্যুও আপনার হাতেই লিখে দিয়েছে। আজ না হোক কাল নিয়তি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে। শিকারেব অভিজ্ঞতা থেকে এই আমার স্থির বিশ্বাস।"

এই নরখাদক বাঘের উপদ্রব কয়েক বছর থেকে হাজারিবাগ ও তৎসংলগ্ন হাজারিবাগের পশ্চিমে পালামৌর টোড়ী অঞ্চলে নিয়মিত

চলছিল। হাজারিবাগ শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে পালামৌর সীমানা এসে মিশেছে। পালামৌর সদর ডাল্টনগঞ্জ থেকে সীমানা পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূর এবং এই একশ' মাইলের প্রায় পঁচাশী মাইল সমস্তটাই পাহাড়ে জঙ্গলে খোয়াইয়ে চড়াইয়ে উৎরাইয়ে ভরা—কোথাও বা নিরবচ্ছিন্ন, কোথাও বা ছাড়া ছাড়া। যে সময়কার কথা বলছি সে সময়টায় একটিমাত্র পথ ছিল হাজারিবাগ থেকে পালামৌযাবার। গরুর গাড়ি চলবার উপযোগী এই পথেই কোনও মতে মোটরও যেত। এই সব অঞ্চলের ক্ষেত ও ফসল রক্ষার জন্য হয়তো চল্লিশ-পঞ্চাশটি মাত্র গাদা বন্দুকধারী ছিল। শিকারের উপযুক্ত পরিশ্রম সাহস ও অধ্যবসায়শীল শিকারী খুব কমই ছিল। শিকার প্রচুর এবং গ্রামবাসীরাও শিকারে স্বেচ্ছায় সানন্দে যোগ দিত। যেখানে পয়সা দেওয়া হয় রোজ দুআনা এবং আধসের ছাতু ও উপকরণ, অর্থাৎ আরও দুআনা, এই চার আনাতেই লোকে সন্তুষ্টচিত্তে অক্লান্ত পরিশ্রম কর'ত ও শিকার উপভোগ কর'ত।

গ্রীষ্মের অগ্নিবর্ষী রৌদ্রে এই সব পাহাড় অরণ্য ও প্রান্তরের সব ঘাস লতা পাতা ছোট ছোট গাছ দগ্ধ করে। রিক্তপত্র গাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকে প্রাণহীন। তলায় ঝরে পড়া শুকনো পাতায় গ্রামবাসীরা আগুন লাগিয়ে দেয়, কারণ পোড়া কালো মাটির কোলে যখন মহুয়ার সাদা ফুলগুলি ঝরে পড়ে, সহজেই তারা সেগুলি সংগ্রহ করতে পারে। গ্রীষ্মশেষে নেমে আসে বর্ষা, ছোটনাগপুরের পর্বতময় ঢেউ দোলান পটভূমিকা যায় পরিবর্তিত হয়ে। নতুন প্রাণের সঞ্চারে সঞ্জীবিত হয় অরণ্য প্রকৃতি।

এই নরখাদক বাঘ, বর্ষায় ফিরে যেত পালামৌয়ে টোড়ী পরগণার জঙ্গলে। শীতের প্রথমে সে সেখান থেকে আস্তে আস্তে ক্রমে হাজারিবাগের দিকে আসত এবং তার সাধারণ খাদ্য বন্যজন্তুর সঙ্গে অন্যান্য বাঘের মতই গ্রামের উপকণ্ঠে যে সব গরু-মোষ চরতো তাদেরও খেত, কিন্তু তার রুচি অনুযায়ী সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে মানুষ

খেত। তার বিশেষত্ব ছিল এই যে, মানুষ যাদের মারতো প্রায় সবই মেয়ে এবং জাতে তেলী। যতদূর সংবাদ নিয়ে তখন জেনেছিলাম চব্বিশ-পঁচিশটি মানুষ এই বাঘের মুখে প্রাণ হারায়, তার মাত্র দুটি পুরুষ এবং এরা দুজনেও জাতে তেলী। ব্যাপারটা হয়ত আকস্মিক, কিম্বা কে জানে আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে এর কোনও সংযোগ আছে কিনা। যে সব মেয়েরা জঙ্গলে কাঠ ফল মুল এবং দড়ির জন্য সাবে ঘাস সংগ্রহ করতে যেতো তাদের থেকেই এই বাঘ আহার্য সংগ্রহ কর'ত।

সেই বছর শীতে শোনা গেল হাজারিবাগের পশ্চিমে সিমেরিয়ার কাছে বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে। মিঃ মার্ফির প্রথমবারের হাতছাড়া হওয়া সেই বাঘ। খবর পেয়েই আমি আমার ভাগ্নে শচী ও হেদলাগের জমিদার শিকারী বন্ধু ইয়াকুব খান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম, সেখানে সত্যিই বাঘের অস্তিত্বের চিহ্ন আছে কিনা পরিদর্শন করতে। স্থানীয় একজন আমার জানা শিকারী ছিল। জাতে রাজপুত, সেও চলল সঙ্গে। গ্রাম ছাড়িয়ে তিন-চার মাইল বনের মধ্যে আমরা পায়ে হেঁটে চললাম। এ জায়গাটা উঁচু-নিচু খোয়াইয়ে ভরা এবং জঙ্গল খুব ঘন। পরীক্ষা করতে করতে জলের ধারে বাঘের পদচিহ্ন পেলাম। মস্ত বাঘ এবং পুরুষ, এ তার পদচিহ্নে সুস্পষ্ট। বাঘ এ বনেই আছে অতএব এখানেই মোষ বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে এই স্থির করে আমরা ফিরে চলেছি। হঠাৎ চোখে পড়ল, বনের দিকে যেতে আমাদের যে-পায়ের দাগ পড়েছে তার উপর বাঘের পদাঙ্ক। তার মানেই তো বাঘের তত্ত্ব নিতে আমরা যেমন এগিয়ে চলেছি, সেও আমাদের পিছনে পিছনে চলেছে আমাদের তল্লাসে। পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে আমরা পিছন দিকে ফিরে চললাম দেখতে যে, আমাদের ফেরার পথেও সে আমাদের অনুসরণ করছে কিনা। একটু দূর গিয়েই দেখলাম আমাদের অনুমান মিথ্যা নয়, ফেরার পথে আমাদের পায়ের ছাপের উপর তার ছাপ রয়েছে।

পিছন থেকে আড়ালে অন্তরালে সে আমাদের অনুসরণ করে চলেছে, ফাঁক পেলেই আমাদের যাকে বাগে পাবে শেষ করবে। শিকারীর জীবনে সে সম্ভাবনা তো সব সময় আছেই। পলকের আড়ালে অপেক্ষা ক'রে থাকে মৃত্যু, লুকোচুরি খেলে, কখনও হয় তার জয় কখনও বা পরাজয়। মিঃ মার্ফির শিকারের জন্য বন্দোবস্ত করছি, তাই বাঘকে এড়িয়েই আমরা অমৃতির প্যাঁচের মত নিজেদের পথটিকে পরিক্রমা করতে করতে ফিরে চললাম, যাতে আমাদের সে অনুসরণ করছে কিনা সেটাও নজরে পড়ে।

সে বনেই কদিন মোষ বাঁধবার ব্যবস্থা করলাম। প্রথম দিন বাঘে মোষ ধরল না কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই খবর এল, বাঘে মোষ মেরেছে। খবর পেয়েই সেখানে চলে গেলাম এবং দেখলাম মোষটিকে মেরে বাঘ টেনে নিয়ে গেছে। যেখানে ঝোপের আড়ালে তাকে ফেলে রেখে গেছে সেখানে মাচা করবার মত মাত্র একটি গাছ আছে। সেই গাছেই তাড়াতাড়ি মাচা বাঁধালাম। ক্ষণস্থায়ী শীতের দিন শেষ হবার আগেই মিঃ ও মিসেস মার্ফিকে সেই মাচায় উঠিয়ে দিয়ে আমি অল্পদূরে একটি গাছের উঁচু ডালে আশ্রয় নিলাম। সেটা ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে এগিয়ে এল রাত্রি। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনও তিথি। গাছের পাতাগুলি ঝিকমিক করছে জ্যোৎস্নার আলোয়, মাটির উপর আঁকা ছায়ার আলপনা। শীতের তীব্র কন্‌কনে হাওয়া মাঝে মাঝে জাগিয়ে তুলছে শিহরণ অরণ্যের শাখায় শাখায়, সেই সঙ্গে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। নিজের নিঃশ্বাসেরই উষ্ণ হাওয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে দৃশ্যমান হয়ে। মাঝে মাঝে হাতটাকে কোটের ভিতর ঢুকিয়ে নিজের শরীরের উত্তাপে প্রাণ সঞ্চার করে নিচ্ছি, সর্বাঙ্গ জমে আসছে কন্‌কনে হাওয়ায়। আশায় অপেক্ষায় শীতে যখন মন শ্রান্ত হয়ে এসেছে এমন সময় বাঘ এল চক্ চক্ করে নিজের মুখ চাটতে চাটতে। মরা মোষটি যেখানে পড়ে, তার

কাছে গেল। মনে ভাবলাম, এবার আর সে মৃত্যুর হাত এড়াতে পারবেনা। হঠাৎ কিসে যে তার সন্দেহ জাগল মৃদুকণ্ঠে একবার সে শব্দ করল এবং দুচারবার এদিক ওদিক ঘুরে হু-ম্-ম্-ম্ করে এক হুঙ্কার দিয়ে আমার গাছের তলা দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার পদধ্বনি পেলাম কিন্তু আবছা আলোয় দেখতে পেলাম না তাকে।

মিঃ মার্ফিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হল ? তিনি বললেন, "কিসে যেন সন্দেহ হওয়ায় ও চলে গেল, কি করা যায় এবার বলতো ?" বললাম, "একবার যখন সন্দেহ জেগেছে তখন অপেক্ষা করা নিষ্ফল।" অতএব সেদিনও সে বাঘ মৃত্যুর হাত এড়িয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই বোর্ড অফ রেভিনিউর মেম্বর পদে নিযুক্ত হয়ে মিঃ মার্ফি পাটনাতে চলে গেলেন, কিন্তু মন তাঁর পড়ে রইল হাজারিবাগের বনে-জঙ্গলে। যাবার সময় বলে গেলেন, শিকার সম্ভাবনার বার্তা পেলেই চলে আসবেন এখানে।

কয়েকমাস পরেই ইস্টারের ছুটিতে এখানে শিকারে আসতে চান, এই মর্মে আমায় চিঠি লিখলেন। আমি সেই অনুসারে সিমেরিয়ার কাছে বনে শিকারের পরিকল্পনা করছি। এমন সময় খবর এল—হাজারিবাগ থেকে বাইশ মাইল দূরে লেপোর কাছে টুটিলওয়ার বাজার থেকে হাট সেরে বনের ভিতর দিয়ে গ্রামের পথে ফিরে চলেছিল কতগুলি পথচারী। শীত শেষ হয়ে গেছে, গ্রীষ্মের প্রখরতা তখনও শুরু হয়নি। এই পথচারীদের মধ্যে একজন দলছাড়া হয়ে একটু পেছিয়ে যায়। সে হঠাৎ দেখে প্রকাণ্ড এক বাঘ তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে রাস্তা পার হয়ে তার সঙ্গী-সাথীদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ঘুরে আসছে। যাঁহা দেখা, সে তাড়াতাড়ি পাশের একটি শালের গাছে তরতরিয়ে উঠে চলল আত্মরক্ষা করতে। বাঘের দৃষ্টি তার দিকে ছিলই, সেও সগর্জনে মুহূর্তের মধ্যে এসে সেই গাছে উঠতে শুরু করল। এদিকে প্রাণভয়ে ভীত পথচারী প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল—

"আরে বাঘ হো, খেলকেই হো, মারলেলকেই হো, বাঘ রে বাঘ" ইত্যাদি।

প্রত্যেক জীবেরই অন্তর্নিহিত বাঁচবার প্রেরণা অপরিমেয়। সে দেখছে, বাঘ তাকে অনুসরণ করে গাছে উঠছে। তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একটি মাত্র চিন্তা তাকে তখন ঘিরে রয়েছে, তাকে বাঁচতে হবে, আত্মরক্ষা করতে হবে চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সে এ ডাল থেকে ও ডাল, মোটা থেকে সরু, ক্রমে আরও সরু ডালে উঠে চলেছে মগ ডালের দিকে। বাঘও, শিকার যখন হাতে পেয়েছি যাবে কোথায় ভেবে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলেছে। লোকটির সঙ্গী যারা এগিয়ে গিয়েছিল এ চিৎকার শুনে একটু থমকে দাঁড়াল। কেউ কি তামাসা করছে তাদের সঙ্গে? নাতো, এতো সেই লোকটিরই কণ্ঠস্বর, তাদের সঙ্গীর। তাড়াতাড়ি তারা দৌড়ে চল'ল শব্দ লক্ষ্য করে। এসে দেখে ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে লোকটি তার ভার সইবার মত ক্ষীণতম সর্বোচ্চ ডালের উপর, আর তার থেকে কিছু নিচে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে বাঘের বিশাল ভারি দেহ দেখা যাচ্ছে, এ সেই নারীখাদক বাঘ। তারা সমস্বরে "ধুর রে, ধুর রে" ও লাঠিসোঁটা যার কাছে যা ছিল মাটিতে পিটতে শুরু করায় বেগতিক দেখে বাঘ গাছ থেকে নেমে পালাল। গাছের উপরের লোকটির হাত পা তখন থরথর করে কাঁপছে। কোনমতে সঙ্গীরা মাথার পাগড়ি খুলে তাই দিয়ে তাকে বেঁধে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনে। খবর পেয়েই আমি সেখানে গেলাম এবং দেখলাম নরম শাল গাছের তিরিশ ফুট উপর পর্যন্ত বাঘের নখের দাগ রয়েছে।

মিঃ মার্ফিকে লিখলাম, শিকারের বন্দোবস্ত প্রস্তুত, পত্রপাঠ আসুন। তিনি ও মিসেস্ মার্ফি আসাতে ঘটনাটি তাঁদের সব বললাম। তাঁরা তো হেসেই অস্থির। বললেন, এ যে গল্প কথা, বড় বাঘ গাছে ওঠে এও কি সম্ভব?

আমি তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। বাঁশের সিঁড়ি আগেই

করিয়ে রেখেছিলাম। তা দিয়ে উঠে ওঁরা দেখলেন নখের দাগ গাছের গায়ে, তখন বিশ্বাস হল এবং বিস্মিত হলেন তাঁরা। লোকটির মৃত্যুর গ্রাস থেকে ফিরে আসার কথাই মনে হতে লাগল সকলের।

সেই গাছটির কাছের বনেই সেবার মোষ বাঁধা হল। বাঘ মোষ মেরেছে খবর পেয়েই আমরা গেলাম সেখানে। মরা মোষটির কাছেই মাচা, সেখানে বেলা থাকতেই গিয়ে বসলাম। মিঃ ও মিসেস মার্ফিকে বললাম, বাঘ যে রকম নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে তাতে বেলা থাকতে থাকতেই আজ সে আসবে। আমার ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যা হল না। আমরা বসার অল্প পরেই বাঘ এল। এবার তার পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছিল। বন্দুক তুলে লক্ষ্য করে মিঃ মার্ফি একটি গুলি করতেই বাঘ উল্টে পড়ে গেল। এমনি করে তিনবারের বার মিঃ মর্ফির হাতেই তার নারীখাদক জীবনের শেষ হল।

পনর

পথের দেওতা

অনাদিকাল থেকে মানুষ জানতে চেয়েছে চির অজানাকে, আপন কল্পনা দিয়ে রচনা করেছে তার স্বরূপের ছবি, তারই পায়ে নিবেদন করেছে ভক্তির অর্ঘ্য। সেই বিরাট অনন্ত-শক্তির পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে, তাকে প্রসন্ন ক'রতে চেয়েছে উপাসনার বিচিত্র পথ দিয়ে। ছোটনাগপুরের অধিবাসীদের মধ্যে বহু রকমের উপাসনার প্রচলন আছে। হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে, বহু শতাব্দী ধরে তাদের মধ্যে বাস করে ক্রমে এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এরাও যে বিরাট হিন্দু সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার প্রধান পরিচয়, প্রায় প্রতি গ্রামেরই মণ্ডপ বা দেবস্থান। এই দেবী মাঈয়ের মণ্ডপ হচ্ছে মন্দিরের আদিম সংস্করণ। বাঙ্গলা দেশের মত জনবহুল একের পর এক সংলগ্ন গ্রাম নয় এদেশের। তরঙ্গায়িত অসমতল দেশে বনের মাঝে দ্বীপের মত ছাড়া ছাড়া গ্রাম। প্রায় প্রতি গ্রামেরই প্রান্তে থাকে এই মণ্ডপ, ৬ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া, ৬ইঞ্চি উঁচু মাটির লেপা বেদী, তার চার কোণে চারটি খুঁটির উপর খাপরার চালা পাঁচ ফুট উঁচু। সেই মণ্ডপের ভিতরে থাকে সাধারণতঃ মাতৃত্বের প্রতীক, স্তনের মত আকৃতি দুটি মাটির ঢিপি এবং তার পাশে একটি লোহার ত্রিশূল, বিশ্বপিতা ও জগন্মাতার প্রতীকস্বরূপ। কোন কোন জায়গায় দুইয়ের জায়গায় নয়টি বা তার চেয়ে বেশীও দেখেছি। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর শুনেছি দুর্গারা নয় বোন, এ তারই চিহ্ন অর্থাৎ নবদুর্গার চিহ্ন। প্রায় সময়েই দেখা যায়, গ্রাম ছাড়িয়ে যেখানে ফসল ক্ষেত সুরু হয়েছে তারই কাছে কোন আম্রকুঞ্জের পাশে একটু উঁচু জায়গায় এই মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত হয়। কতো সময় দেখেছি, চালা নেই এমনি মণ্ডপ এবং এই মণ্ডপের পাশে থাকে দুটি বা একটি ফুলগাছ, বেশির ভাগই

গোলক চাপা, যাকে এরা বলে 'গুলেইচি' কারণ বিনাযত্নে অল্প আয়াসেই এরা বেড়ে ওঠে অরণ্যবাসী শিশুরই মত।

আদিবাসীদের ভিতরে যারা এখনও হিন্দু সংস্কৃতিকে আপনার করে নেয়নি, সেই সব উরাঁও মুণ্ডাদের উপাসনার স্থান হল 'শরণা'। দু একটি বড় গাছকে ওরা বনদেবতার আশ্রয় বলে পবিত্র মনে করে। সেই দু-একটি গাছ ও তার আশপাশের কয়েকটি গাছকে তারা সযত্নে রক্ষা করে। খুব ঘন জঙ্গল যেখানে সেখানে গ্রাম থেকে দূরে বনের গহনে বড় শালগাছ নিয়ে যে বীথি সেই তাদের 'শরণা'। মনে পড়ে ১৯০৭ সালে কীতা ও সিলির মাঝে তখন রেলপথ বিছানো হচ্ছে পুরুলিযা থেকে রাঁচিকে সংযুক্ত করবার জন্য, সেই সময় রাঁচীতে মোরাবাদীতে আমাদের বাড়ী তৈরি হচ্ছে। বাড়ীর কড়ি-বর্গা তৈরির জন্য কাকামণি সিলির কাছে এমনি একটি শরণার কতোগুলি শালগাছ কিনলেন মাত্র দশ টাকায়, যা প্রায় ৪০।৫০ বছর ধরে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে তখনও। মুস্কিল হল গাছ কাটতে কেউ রাজি নয় শরণার গাছ বলে। বইসিক্লে করে গেলাম, সেখানে গিয়ে গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। তারা বলল, কাটাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ও গাছগুলি যে সব ভূতেদের আশ্রয়, তাদের পূজো করে অন্য গাছ নিয়ে যেতে হবে, তাতে টাকা লাগবে। দেবতার সঙ্গে ভূত-প্রেতেরও এরা পূজারী। যাই হোক ১৬৲ দিলাম পূজার জন্য, পূজার পর তারা অনুমতি দিল কাটবার। কিন্তু সে গাছে কুঠারাঘাত করতে কেউ প্রস্তুত নয়, অর্থের প্রলোভনেও নয়, এমনি দৃঢ় তাদের সংস্কার। শেষে সিলির কাছে কয়েক ঘর আদিবাসী খ্রীষ্টান ছিল তাদের আনিয়ে গাছ কাটিয়ে গরুর গাড়ী করে নেওয়াই। এরকম শরণা প্রায় প্রত্যেক ওরাঁও বা মুণ্ডা গ্রামে আছে।

আদিবাসীদের মধ্যে যারা নিজেদের গোয়ালা বলে, কিংবা যে গোয়ালারা বহু পুরুষ পর্যন্ত আদিবাসীদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস

করছে তারা পূজো করে বীর কুঁবরকে। এর মূর্তিও গ্রাম ও ক্ষেতের সীমান্তে কাঠের খুঁটোয় উপর মাথা, মুখ এবং গলা খুদে তৈরি করা হয়। তাই মাটিতে পোঁতে, এরই নাম বী কুঁবর। কচিৎ কখনও কাঠের খুঁটির বদলে পাথরের লম্বা টুকরা পোঁতা হয়।

ফসল রোপণ, বিয়ে বা যে-কোন শুভকাজে বা বিপদ আপদ থেকে মুক্তির আশায় এই সব দেবস্থানে পূজা দেবার রীতি। আদিবাসীদের পুরোহিতকে ওরা কোথাও বলে বৈগা কোথাও বা পাহান। তারা মাথার পিছনে জটার মত টিকি রাখে।

কিন্তু পথল দেওতা বোধ হয় পালামৌর নিজস্ব দেবতা সৃজনের প্রভাতে ছোট-বড় নানা আকারের নানারকম পাহাড় সাজিয়ে বিধাতা রচনা করেছিলেন পালামৌ জেলাকে। কোথাও বা চলে গেছে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়ের ঢেউ, কোথাও বা এইসব গিশি বব ও চড়াই-

উৎরাইয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পথ কেটে বসে গেছে, পাহাড়ের প্রস্তরময় দেহে। কখনও বা জমিদারের বড় ঘোড়া, কখনও দরিদ্রের ছানাটু (টাট্টু), বেনে ব্যবসায়ীর লাদনা ঘোড়া বা লাদনা বয়েল সমান ওজনের দুটি শস্য ভর্তি বোরা কিংবা ঘিয়ের টিন পিঠের দুদিকে ঝুলিয়ে নিয়ে অতিক্রম করছে এই সব দুর্গম পথ। পালামৌর দক্ষিণ সীমায় সুরগুজার দুরধিগম্য গ্রাম থেকে এইসব অরণ্যজাত দ্রব্য নিয়ে ব্যবসায়ীরা ডালটনগঞ্জ বা গাড়োয়া পর্যন্ত যায় আবার সেখানকার বাজার থেকে কিনে নিয়ে যায় কাপড়, নুন, কেরোসিন বা তামাক। বর্ষার জলধারা নেমে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে, সঙ্গে নিয়ে আসে আলগা মাটি থেকে ধুয়ে আনা অজস্র নোড়ানুড়ি। পাহাড়ের গায়ে এই পথরেখার উপর ছড়িয়ে দিয়ে যায় তাদের। চড়াই-উৎরাই ঘাটের কাছে জমে ওঠে নুড়ির রাশি। তখন প্রতিষ্ঠা হয় পথল দেওতার। ঘাটের ধারে কোনও গাছের নীচে নুড়ির স্তূপ। পথচারী পথ থেকে নুড়ি কুড়িয়ে দিয়ে যায় এই স্তূপের পথল দেওতাকে, সেই তার নৈবেদ্য, কামনা করে বাণিজ্যে সাফল্য, মনোভিলাষের পূর্ণতা, বিঘ্নহীন যাত্রা বা শিকারের সফলতা। ক্রমে স্তূপ বড় হতে থাকে, বাড়তে থাকে পথল দেওতার আয়তন। পথও সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হতে থাকে।

সে সময় আমি খাসমহল অফিসার। একদিন সন্ধ্যায় ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিলবীর আর্দালী এসে সংবাদ দিল, "সাহেব বিশেষ জরুরী কাজে এখনই আপনাকে ডাকছেন হুজুর।" হন্তদন্ত হয়ে যেতেই মিঃ কিলবী বললেন, "বিজয়, সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই দেখ সুরগুজা রাজার টেলিগ্রাম," "When I am in the British territory I consider myself as a guest of the Govt. of India. No arrangement has been made for my stay and suppiles in Garhwa even though due information was given."

"বৃটিশ সরকারের রাজ্যে আমি যতক্ষণ থাকি আমি নিজেকে ভারতীয় সরকারের অতিথি মনে করি। যথাসময় সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও আমার থাকবার বা রসদের ব্যবস্থা হয়নি। সুরগুজার রাজপরিবার দেরাদুনে যাচ্ছেন, আজ তাঁদের গাঢ়োয়া পৌছানোর কথা। নিয়ম অনুসারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তাদের রসদের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে কিন্তু আমি সে কথা একেবারেই ভুলে গেছিলাম। রাজা ভারত সরকারকে এই ক্রটি নিয়ে লিখবেন, তুমি শীগ্‌গির যাও আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে যা হয় করো।" রাত সামনে, আমি গাঢ়োয়া পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে, দেখা করবার সময় আর থাকবে না, তাই পরদিন খুব ভোরে সেখানে গিয়ে পৌছব নিশ্চয়ই, মিঃ কিলবীকে সেই আশ্বাস দিয়ে বাড়ী গেলাম।

পরদিন আমার সর্বত্রগামী রোভার মোটর বাইকের শব্দে নিস্তব্ধ বন মুখরিত করে যখন গাঢ়োয়া পৌঁছলাম তখন সবে সূর্যোদয়ের অরুণচ্ছটা পুব আকাশে দেখা দিয়েছে। রাজপরিবার আমি পৌঁছবার আগেই গাঢ়োয়া ছেড়ে স্টেশনাভিমুখে চলতে সুরু করেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর জিনিসপত্রের বাহক হয়ে যে হাজার গ্রামবাসী শোভাযাত্রা করে তাঁদের অনুগমন করেছে রাজকীয় প্রথানুসারে, তার শেষ কয়েকজন তখনও গাঢ়োয়া ছাড়েনি, সব চলার পথে। আমিও তখনই সোজা মহারাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখি বিচিত্র সাজে বিচিত্র গ্রামবাসী নর-নারীর শোভাযাত্রা, বেশীর ভাগই আদিবাসী। কারু হাতে একজোড়া খড়ম, কারু বা পাখা, বা ছাতা বা ছড়ি, কেউবা নিয়েছে জলের কলসী, কেউ জ্বালানী কাঠ, কারু মাথায় বাক্স বা পুঁটুলী এমনি করে কিছু না কিছু সকলেই নিয়ে চলেছে। কারু পরনে অতি মলিন ছিন্ন কাপড় অথচ গায়ে গাঢ়োয়া বাজার থেকে সদ্য কেনা নূতন জামা, কেউ বা শুধু পাগড়ী ও নেংটি পরা, কোন মেয়ে হয়তো

পিঠে ছেলেকেবেঁধে নিয়ে চলেছে। প্রায় সকলেরই হাতে লাঠি বা টাঙ্গি তাদের পথের সাথী। এই জনতার পুরোভাগে প্রায় ১০০ নিটোল দেহ বিশালকায় হাতীতে চলেছেন রাজপরিবার ও পুরবাসী। গাঢ়োয়া স্টেশনের কিছু আগে কোয়েল নদী, সেই নদীর এপারেই তখন প্রায় জনতা ওপারে কেবল সবে কয়েকটি হাতী পার হয়ে গেছে। ওপারে তাঁবু খাটান হচ্ছে, স্পেশাল ট্রেণ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবার জন্য এগিয়ে যেতেই প্রথম দেখা হল রাজবৈদ্য বাঙ্গালী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য তাকে জানাতে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন রাজসমীপে। হাতী থেকে নেমে তিনি তখন দাঁড়িয়ে সব পরিদর্শন করছেন, কাছেই বছর দশেকের রাজপুত্র একটি '২২ বোরের দোনলা বন্দুক নিয়ে শিকারের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরছেন। শুনলাম ইনি এই বয়েসেই চিতা পর্যন্ত শিকার করেছেন। আসবার পথে রাজা ও রাণী দুই পথে শিকার করতে করতে এসে নিজেদের রাজ্যের সীমান্তে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ এলাকায় প্রবেশ করেছেন। উভয়েই ভাল শিকারী। রাজা-বাহাদুর কয়েক শত বাঘ মেরেছেন এবং সে যাত্রায়ই রাণী বাঘ শিকার করেছেন। রাজা-বাহাদুরকে অভিবাদন করে সব অবস্থা বুঝিয়ে বললাম যে ডাকের গোলমালে সময়মত তাঁর আগমনবার্তা পৌঁছোয়নি, যা ত্রুটি হয়ে গেছে তার জন্য ভারত সবকারেব পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি। তিনি সব বুঝলেন এবং বললেন যে ঠিক আছে। তাঁর কাছ থেকে গিয়ে সংবাদ নিলাম কি কি জিনিস তাঁরা পেয়েছেন এবং আরো কি কি চাই। গাঢ়োয়ার বাজারের চৌধুরী সরকারের হুকুম না পেয়েও প্রথানুসারে জিনিসপত্র দিয়েছিল। যাই হোক ফর্দ নিয়ে তখনই গাঢ়োয়া বাজারের চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে বাকী জিনিসপত্র গরুর গাড়ীতে রওনা করে আবার গেলাম রাজার কাছে। এখানে বলে রাখি যে, এ সবেব দাম রাজ-সরকারই দিতেন। যাই হোক রাজাবাহাদুরের সঙ্গে পুনরায় দেখা করে তাঁর কাছে থেকে

সব ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র মিঃ কিলবীর নামে নিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিলাম।

ফেরার পথে দেখি পথপাশের এক পথল দেওতার আয়তন হঠাৎ যেন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৌতূহল হওয়ায় পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম শোভাযাত্রীরা সকলে নুড়ি দিয়ে গেছে পথল দেওতাকে, নির্বিঘ্ন যাত্রার কামনায় তাই আয়তন বৃদ্ধি। আমিও পথপাশ থেকে দুটি নুড়ি তুলে দিয়ে গেলাম পথল দেওতাকে, মহারাজার যাত্রা হোক সুগম এবং মিঃ কিলবীর আসন্ন বিপদে শান্তি কামনা করে।

ষোল

বাইসন

১৯১৬ সালের এপ্রিলের শেষদিনে ভোরের অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে প্রথম বাইসন দেখি পালামৌর চেমো গ্রামের সামনে। তিরিশ-চল্লিশটি বাইসন নিয়ে এই যূথ। যূথপতি এবং যূথের অন্যান্য সকলেরই ঘন কৃষ্ণ সুস্পষ্ট দেহ, দেড় টন ওজন তো হবেই, হয়তো আরও কিছু বেশি। প্রকাণ্ড মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকান সুতীক্ষ্ণ একজোড়া শিং, যার গোড়ার পরিধি প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি। কোয়েলের ধারে গজিয়ে ওঠা নতুন ঘাস খেয়ে চরতে চরতে ওপারের মেরালের সংরক্ষিত ঘন বনে ঢুকে গেল। সংরক্ষিত বনে বিনা ছাড়পত্রে শিকার নিষিদ্ধ এবং শিকারের আইন ভঙ্গ করলে সমূহ বিপদ সুনিশ্চিত জেনে তাদের সেবার শুধু দূর থেকে দেখেই ক্ষান্ত হলাম। তখনও তাদের অভ্যাস স্বভাব ও ভাবধারার কোন পরিচয়ই জানতাম না। কিন্তু দেখবার আগেই এই বাইসন বা 'গওর'যের খ্যাতি এবং অখ্যাতি কিছুদিন আগে রোদো, সিঞ্জো ও বিজকা গ্রামের অধিবাসীদের কাছে শুনেছিলাম এবং তাতে এতই ঔৎসুক্য বেড়েছিল যে স্বচক্ষে দেখবার ও তথ্য সংগ্রহের আশায় এই অঞ্চলের বনে বনে দু-তিন দিন ঘুরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছি, তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন ও চরাগাই (যেখানে চরে) মাত্র দেখে।

সুরগুজা রাজ্যের সীমা-সংলগ্ন পালামৌ-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাঙ্কা ও ভাণ্ডারিয়া থানা এলাকার এই ছোট উঁচু-নিচু পর্বতসংকুল অঞ্চল গহন অরণ্যে ঢাকা। পথ অত্যন্ত দুর্গম। পাহাড়ের গা বেয়ে যে সংকীর্ণ পথরেখা কখনও উঠে কখনও নেমে সর্পিল গতিতে চলে গেছে তাতে পথিক চলে হয় পায়ে হেঁটে নয় ঘোড়ায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় মহাজনদের লাদনা বলদের দল ধীর মন্থর গতিতে দলে দলে পিঠে করে বহন করে নিয়ে চলেছে বোঝা। দ্রব্যসম্ভার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে

অথবা গ্রাম থেকে গারোয়ার বাজারে নিয়ে যাবার অন্য কোনও যানের পথ নেই, তাই হয় মানুষ, নয় বলদই একমাত্র ভারবাহী। এই লাদনা বলদের দলের প্রত্যেকটির গলায় থাকে বিভিন্ন আকারের কয়েকটি ঘণ্ট, কোনটি বা ধাতুনির্মিত, কোনটি কাঠের। বহুদূর থেকে শোনা যায় সমবেত এই বিচিত্র ঘণ্টাধ্বনির রেশ, প্রথম উদ্দেশ্য—হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের সচকিত করে তোলা, দ্বিতীয় কোনটি দলছাড়া হয়ে গেলে তার গলার ঘণ্টার শব্দ লক্ষ্য করে তাকে খুঁজে বের করা সহজ হয়।

গয়ার দক্ষিণ সীমা ও উত্তর পালামৌ-এর গোয়ালারা এই গভীর অরণ্যে দলে দলে হাজার হাজার গরু-মহিষ নিয়ে চরাতে আসে। শীতের শেষে যখন সমতল দেশে গ্রীষ্মের উষ্ণ নিঃশ্বাস বইতে থাকে, শ্যামলিমার ক্ষীণ আভাসটুকুও নিঃশেষ হয়ে আসে, তখন এরা এদের গোধন নিয়ে সুরগুজার অরণ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমশ তিন-চার হাজার ফুট পাহাড়ের শিখরের দিকে উঠতে থাকে। এখানে তখনও শীতের ছোঁয়া লেগে থাকে অরণ্যের ছায়ায়, ঘাস পাতা থাকে সজীব। এরা যেমন পাহাড়ের উপরে চরতে চরতে উঠতে থাকে, মাংসলোলুপ বাঘ, নেকড়ে, চিতা, হায়নাও এদের অনুগমন করে এবং সুযোগ পেলেই নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। প্রথম বর্ষার সজল কাজল ছায়া নিয়ে আসে ঘরে ফেরার আহ্বান। আবার নেমে চলে এরা অরণ্য থেকে জনপদের অভিমুখে, মৃত্যুর অনুচর মাংসাশী জীবরাও অরণ্যসীমা পর্যন্ত চলে পিছন পিছন।

পথ চলতে চলতে কোথাও বা চোখে পড়ে এই নিবিড় অরণ্যের মাঝে দূরে নিচে খেলাঘরের মত ছোট ছোট গুটিকয়েক লাল খোলার চালের ঘর, একটুখানি খোলা জায়গায় দ্বীপের মত জেগে থেকে মানুষের অস্তিত্বের বার্তা ঘোষণা করছে। দু-চার জন দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী যুবক জমিদারদের কাছ থেকে আবাদোপযোগী কিছু জমি বন্দোবস্ত নেয়, বন-জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করে চাষ করে, বন্য পশুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করে, রচনা করে বাসের জন্য কুটির। ক্রমে তারই

আত্মীয় বন্ধু এসে বাসা বাঁধে আসে-পাশে। তারা আনে তাদের গরু, মোষ, হাল, বলদ। দিন, মাস ও দীর্ঘ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রকৃতি ও বন্য পশুর সঙ্গে সংগ্রাম গড়ে তোলে ক্ষুদ্রগ্রাম। এমনি করে গড়ে-ওঠা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামের কথা মনে পড়ে, নাম গৌড়গাড়া। এখানকার রামশরণ রাউতের বাড়িতেই ছিল ভাল দু'হাজার দুগ্ধবতী গাভী, এ ছাড়া আরও বহু গোসম্পদ ছিল তার জঙ্গলের বাথানে। তার এক একখানা সর্ষে ক্ষেতই ছিল প্রায় আধ মাইল লম্বা। আবার এমনও অনেক সময়ই হয় যে, প্রকৃতি ও বন্য হিংস্র পশুব সঙ্গে সংগ্রাম করে ঠিক যখন গ্রামটি গড়ে উঠেছে এমন সময় বে-অগ্রণী তার মৃত্যু বা কোনও রোগের প্রাদুর্ভাবে গরু মোষ মরে গেলে, কিংবা বাঘ ও বন্য জন্তুর উপদ্রবে কোনও বিপদ ঘটলে, সরল আদিবাসী প্রজারা সেটা দেবতার কোপ বা ভৌতিক উপদ্রব মনে করে সে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যায়। অরণ্য আবার ক্রমে সব গ্রাস করে নেয়। অতি দীন দরিদ্র তারা, জগতে নিজস্ব সম্পত্তি বলতে যা তা এতই অল্প যে এক আবাস ত্যাগ করে যাওয়া তাদের পক্ষে কিছুই দুরূহ নয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমনি একটি পরিত্যক্ত গ্রামের চিত্র, রাঙ্কা রাজের বৈরীয়া গ্রাম। ভগ্ন গৃহপ্রাচীর স্তূপে পরিণত হয়েছে, জনমানবের কোনও চিহ্নও নেই। পল্লবঘন আম্রবৃক্ষ, কোথাও বা বট অশ্বত্থ, একদিন যে গ্রাম ছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোথাও কোথাও মানুষের অধিকারের অতীত স্বাক্ষর লেখা রয়েছে ক্ষেতের আলের চিহ্নে। অসংস্কৃত একটি দীঘি পদ্মবনে ঢাকা, তাতে দলে দলে হরিণ এসে জল খেয়ে যাচ্ছে, আমায় দেখে বিস্মিত হয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। মানুষ এদের কাছে এতই অপরিচিত। এদিকের সংরক্ষিত বনে এমন বহু পরিত্যক্ত গ্রাম আছে।

এই দুর্গম অঞ্চলে সাধারণত সরকারী অফিসারদের বিশেষ গতায়াত ছিল না, বড়জোর বছরে একবার কেউ কেউ যেতেন, কেউবা পরিদর্শন করতে, কেউ শিকার করতে। অশ্বারোহণে অপারগ হলে

খাটুলী ছিল তাঁদের যান। একটি দড়ির খাটিয়াকে উল্টে দিয়ে তার চার পায়ার সঙ্গে বাঁশের বাঁকারী বেঁধে তার ভিতর দিয়ে বাঁশ পার করে দেওয়া হত এবং দুপাশে পাল্কীর মতন কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত—এরই নাম খাটুলী। এখানে কেউ বেশিদিন থাকতে চাইতেন না। ম্যালেরিয়া এবং সঙ্গহীনতাই তার একটি কারণ। যে সব পুলিশ কনেস্টবল বা দারোগাকে শাস্তি দেওয়া হবে—তাদের এখানে বদলি করা হত। তাতে তাদের বিশেষ ক্ষতি ছিল না, রাজ-প্রতিনিধি হয়ে তারা সেখানে রাজত্ব করত। রাজার তশীলদাররাও তাই, তারাও যত পারত প্রজাদের শোষণ করত।

১৯১৫-র ডিসেম্বরে যেদিন এই অঞ্চলের কুদরুম ক্যাম্পে এসে এ. এস. ও. শ্রীধনমসি পান্নার কাছে থেকে সেটেলমেণ্টের চার্জ নিলাম, তার দু'দিন আগে গ্রামের প্রান্তে শ্রীধনমসি পান্নার তাঁবুর কাছেই তাঁর অস্থায়ী আস্তাবলে বড় বাঘ এসে তাঁর ঘোড়া খেয়ে গেছে। তার পরের ক্যাম্প কাহ্লারের তীরে বাবদরীতে যখন, তখন একদিন আমার চাকরের বাপ এসে মহা কান্না—একদিন তার ছেলেকে ধরে সে কয়েকজন পথচারীর সঙ্গে রাস্তা থেকে আসছিল। বেলা বারোটা একটার সময় পথে এক জায়গায় একটু এগিয়ে আসে দল ছেড়ে। এক নালার ধারে এসেই দেখে সামনে এক বাঘ পথ আগলে বসল। সে তো দেখেই প্রাণপণে চিৎকার "দৌড়িহা হো, বাঘ হো, পকড়লেই হো" ইত্যাদি এবং তার হাতে যে লম্বা লাঠি ছিল মাটিতে পেটা শুরু করে। ওদিকে বাঘ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার ল্যাজটা এদিক থেকে ওদিক সঞ্চালিত করে মাটিতে পটকাতে থাকে, ভাবখানা যাবে আর কোথায়? ইতিমধ্যে "আওয়াথি হো" করে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সঙ্গী-সাথীরা এসে পড়ে হল্লা করায় বাঘ একটু সরে যায়, ওরাও পার হয়ে পেছনে চাইতে চাইতে কোনমতে এসে পৌছয়। মহাকান্না, এমন ভয়াবহ অঞ্চলে তার ছেলেকে সে রাখবে না।

এমনি দুর্গম অরণ্য পর্বতের মাঝে বিজকা গ্রাম। ১৯১৬ সালের

এপ্রিলে কোয়েল নদীর তীরে পাব্‌রোতে যখন আমার ক্যাম্প, তখন সেখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে বিজকাতে গেলাম। সে গ্রামের মাহাতো বা সর্দার বাইসনের সংবাদ দেবাব সময় বলল যে, এরা সাধারণত মানুষের সব সংস্পর্শ এড়িয়ে জনশূন্য দূর জঙ্গলে থাকে যেখানে মানুষের গলার স্বর পর্যন্ত পৌছায় না। যূথবদ্ধভাবে বিচরণ করে তারা এবং বনরাজ ব্যাঘ্র এদের সম্মিলিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে সাহসী হয় না। ক্বচিৎ যূথভ্রষ্ট দু-একটি অপ্রাপ্তবয়স্ককে বাগে পেলে শিকার করে। কিন্তু যদি মানুষ এই বাইসনদের গতিপথে পড়ে যায় এবং তাদের সন্দেহ উদ্রেক করে তাহলে ওরা হয়ে ওঠে দুর্ধর্ষ, হিংস্র তখনই তাকে শিং দিয়ে শেষ করে ফেলে। এই প্রসঙ্গে সে মিঃ ফ্রাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়লের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলল তার নিজের প্রত্যক্ষ কবা।

আই-সি-এস ফ্রাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়ল ছিলেন পালামৌতে ডেপুটি কমিশনার ১৯০০ সাল থেকে ১৯০২ পর্যন্ত। গ্রামবাসী সকলের সঙ্গেই তাদের আপন জনের মত মেলা-মেশায় এবং সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবব ও ভার নেওয়ায় তাঁর খুবই সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন তাদের সহায ও সৎ পরামর্শদাতা। অন্যদিকে তাঁর শিকার, অসীম সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা তাঁকে সারা জেলায় এনে দিয়েছিল বিশ্বাস, অনুরাগ ও প্রসিদ্ধি। একদিন এই বিজকাতে এসে তিনি ঠিক করেন বাইসন শিকার করবেন। গ্রামের সর্দার ও বৈগা (পুরোহিত) দুই দেশী গাদা বন্দুক এবং সঙ্গে আরও দু-একজনকে ও তাঁকে নিয়ে গেল সেই গভীর বনে বাইসনের সন্ধানে। দূরে জঙ্গলের মাঝে একটু খোলা জায়গার ধারে দেখা যায় এক বাইসন-যূথকে। অতি সন্তর্পণে গাছের ছোপের আড়ালে তাদের দৃষ্টি ও ঘ্রাণ এড়িয়ে গুলি করবার উপযুক্ত কাছে পৌছে মিস্টার লায়ল বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে গুলি কবেন যূথপতিকে। তখনকার দিনে আগ্নেয়াস্ত্র আজকের দিনের মত উন্নত ছিল না, গুলি লাগা সত্ত্বেও যূথশুদ্ধ

যূথপতি পালিয়ে যায় রক্তবিন্দুতে তার গতিপথ চিহ্নিত করে। গুলি যখন লেগেছে তখন ও তো মরবেই, বিশেষত লায়ল সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্য, এই বিশ্বাসে এগিয়ে গেল শিকারীরা সর্বাগ্রে, উৎসুক বৈগা। হঠাৎ মিঃ লায়ল দেখেন ছুটতে ছুটতে তারা ফিরে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তারা বলল যে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় যেতেই সহসা ফিরে দাঁড়ায় যূথপতি এবং ক্রুদ্ধ আক্রোশে বৈগাকে পেড়ে ফেলে সিং দিয়ে তার পেট ও সর্বাঙ্গ চিরে ফেলে, কিন্তু তাতেও তার রোষ শান্ত হয়নি। সে ফোঁস ফোঁস করে ফোঁপাচ্ছে এবং শিঙে করে তার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলছে, আবার সেখানে গিয়ে তাকে ফুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে শিঙ দিয়ে, যেন প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা তার নিবৃত্ত হচ্ছে না। সব শুনে মিঃ লায়ল বললেন, "বন্দুকধারী তুজন মাত্র আমার কিছু দূরে পেছনে থাক, আাম এগিয়ে যাচ্ছি। যদি দেখ বাইসন আমাকে মেরে ফেলেছে তখন তোমরা গুলি কোরো বা পালিও। যতক্ষণ আমি না মরি তার আগে যদি তোমরা গুলি কর তাহলে ফিরে উল্‌টে আমি তোমাদের গুলি করে শেষ করে দেব।" এই বলে কি করতে হবে বেশ করে তাদের বুঝিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি। কিছুদূরে পেছন পেছন চলল সর্দার ও আরেকজন। যেখানে চলেছে আহত বাইসনের তাণ্ডব-লীলা সেই খোলা জায়গার ধারে একটি বড় শালগাছের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি রুমাল বার করে নাড়তে লাগলেন ক্রুদ্ধ বাইসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। চোখ পড়তেই প্রতিহিংসার নেশায় উন্মাদ সে, তখন বৈগার ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ ছেড়ে শিং বাগিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে এল সোজা মিঃ লায়লের দিকে। সর্দারের কথায় "আমরা তো হুজুর তখন বুঝলাম সাহেব তো মরেছেই, এবার আমাদেরও পালা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালাব কিনা ভাবছি। সাহেব স্থির হয়ে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে, অচল অটল, যেন গ্রাহ্যই নাই। গওর যখন মাত্র দশ-বারো হাত দূরে, তখন বন্দুক তুলে সেই মাথা

লক্ষ্য করে গুলি করলেন একবার দু'বার। হুড়মুড় করে এসে বিশাল মাথা গওর লুটিয়ে পড়ল সাহেবের পায়ের কাছে, সাহেব এক তিল নড়ল না।"

এই কাহিনী শুনে আমার বাইসন সম্বন্ধে ঔৎসুক ও শিকারের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল, কিন্তু সে যাত্রায় আর সে ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়ে ওঠেনি। পরে যখন পালামৌ খাসমহলের ভার পাই তখন বাইসন শিকারের রোমাঞ্চকর উত্তেজনার অভিজ্ঞতা লাভের যথেষ্ট সুযোগ এসেছে।

হিংস্র পশু শিকারে আত্মবিশ্বাস, দুর্দমনীয় সাহস এবং ভয়ের যত বড় কারণই থাক, তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করার দু-তিনটি ঘটনায় ও অঞ্চলে আদিবাদী, অরণ্যবাসী, বড় অফিসার ও শিকারীদের মধ্যে আমার একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল। পালামৌ খাসমহলের ভার নিয়েই বাইসন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। বইসনকে ওরা বলে 'গওর'। জানলাম, বাইসনরা তৃণভোজী। গভীর বনের মাঝে যে পরিত্যক্ত গ্রাম ও তার লাগা ধানক্ষেত বা নালা-নদীর ধারে বড় গাছ খুব সহজে জন্মায় না, ছেয়ে যায় অজস্র ঘাসে। বর্ষাব জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে এসে বাধা পায় এই ঘাসের বনে। তাতে সারা জায়গা হয়ে ওঠে স্যাঁৎসেতে, ঘাসরা আবও জোর পেয়ে মাথা তোলে, কোথাও কোথাও হয়ে ওঠে হাতীব পিঠ সমান উঁচু। এমনি জায়গা বাইসনের প্রিয় বিচরণভূমি।

ধ্যানমগ্ন নেতারহাট পাহাড়ের তিন হাজার আটশ' ফুট উন্নত শিখর থেকে চঞ্চলা ঘাঘরী প্রপাত ধাপে ধাপে নেমে এসে নালা বেয়ে গিয়ে মিশেছে উত্তরবাহিনী কোয়েলের সঙ্গে। নালাটি অধুনালুপ্ত পাণ্ডুা নামে একটি গ্রামের কোল বেয়ে যাওয়ায় নাম নিয়েছে পাণ্ডুানালা। এই নালার কোয়েলের সঙ্গে সঙ্গমের ধারেই আছে নোনা মাটি, ইংরিজিতে যাকে বলে Salt lick। সত্তর-আশী ফুট জায়গা নিয়ে জলার মত দেখতে। সেই নোনা মাটি চাটতে আসে হরিণ, শম্বর ও

বাইসনের যূথ। জায়গাটির নাম মুরাছাপ্পর। স্থির করলাম আগে কাছে থেকে এই বাইসন যূথকে দেখব।

১৯২০ সালের বর্ষাকাল। মুরাছাপ্পরের সেই জলার কাছে চার হাত লম্বা চার হাত চওড়া কোমর সমান এক গর্ত খোঁড়ালাম কাছের একটু উঁচু জায়গায়। তারপর গরুর গাড়ির ছৈয়ের মত বাঁশের কঞ্চি ও মাহুলানের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছৈ তৈরি করালাম। চারিদিক দিলাম ডালপালা দিয়ে ঢেকে। কিছুদিন আগে 'বেস্ট হ্যাণ্ড ল্যনটার্ণ' নাম দিয়ে কলকাতার সাতকড়ি দাস এণ্ড কোং সবে প্রথম দু'ডজন পেট্রোম্যাক্স নমুনা আনায় তার একটি কিনেছি। সেই আলোটি জ্বেলে সেই ছইয়ের উপরের একটি বাঁশের ডালার উপর রেখে তাকে একটি টুকরী দিয়ে ঢেকে দিলাম। টুকরীটিতে আগেই গোবর-মাটি লেপে দেওয়া হয়েছে যাতে ভেতর থেকে আলো ফুটে না বেরোয়, এবং টুকরীর মাথা চিরে গরম হাওয়া বেরোবার পথ করা হল। একটি চোপের দড়ি দিয়ে টুকরীটি আটকে মাথার উপরের গাছের ডালের সঙ্গে কপিকল দিয়ে বেঁধে, সেই দড়ির প্রান্তটিকে আনা হল ছইয়ের ভেতর দিয়ে নিচের গর্তে। দড়িটি ধরে টানলেই যাতে টুকরীটি উঠে যায়। আরেকটি সুতো আলোর দীপ্তি নিয়ন্ত্রণ করবার যন্ত্রটির সঙ্গে বেঁধে ভেতরে আনা হল, গর্তের মধ্যে যাতে সেটা টানলেই আলোর দীপ্তি বেড়ে ওঠে। এমনিভাবে প্রস্তুত হয়ে সন্ধ্যার ছায়া যখন নেমে আসছে এমনি সময় সেই গর্তের ভেতরে গিয়ে বসলাম, মাথার উপর টুকরী-ঢাকা আলো স্তিমিত করে রেখে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। নেমে এল রাতের অন্ধকার বনের ছায়ায় আঁধারতর হয়ে। পাশেই কোয়েলের জল পাথর থেকে পাথরে ও কিনারায় আহত হয়ে বয়ে চলেছে আপন পথে কলস্বরে ব্যক্ত করে তার বেদনার ভাষা। বহুক্ষণ কেটে গেল প্রতীক্ষায়। মশার তাড়নায় অস্থির হলেও নড়বার উপায় নেই। রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে শুনতে পেলাম ভারি জন্তুর সমবেত পদশব্দ। ক্রমে নিকট হতে

নিকটতর হতে থাকে শব্দ। স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকি। আরও কাছে, আরও কাছে, এবার এরা হজবজ করে জলায় নেমেছে আমার সন্নিকটে। আস্তে সুতোটিতে টান দিতেই মাথার উপর হিস্-স্-স্-স্ করে ওঠে পেট্রোম্যাক্স, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার আলো। দড়িটি ধরে একটান দিতেই পলকের মাঝে উঠে যায় অন্ধকারের যবনিকা, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আলোর নিচে অন্ধকারে বসে দেখি। নিঃশঙ্কচিত্তে চরমান সেই বাইসন-যূথ হঠাৎ সেই আলোকের প্রকাশে স্তম্ভিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়। অতি নিকট থেকে দেখি তাদের সেই ঘন বাদামী রঙের বিশাল নধর চিক্কণ দেহ, পিঠের উপর ঈষৎ উন্নত কুব্জ। ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়ায়, তারপর দুড়দাড় করে চলে যায় অরণ্যের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে।

দেখবার আশা তো মিটল, এবার জাগল শিকারের নেশা। পাণ্ডা নালার ধারে অতীতে যে গ্রামটি ছিল পাণ্ডা, এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই, ভাঙা আলের চিহ্ন কোথাও কোথাও ছাড়া। যে জায়গায় আবাদী ক্ষেত ছিল সেখানে দশ পনের ফুট লম্বা ঘাস মাথা তুলেছে, এত ঘন যে মানুষের অগম্য। শীতের সময় সেই ঘাসের আগা শুকিয়ে ওঠে। আমার নির্দেশমত খাসমহল গ্রাম রুদের অধিবাসীরা তাতে লাগিয়ে দেয় আগুন। সে ঘাস পুড়ে গেল দিন কয়েকেই। সেখানে গজিয়ে ওঠে নতুন ঘাস, বাইসনের অতি প্রিয় খাদ্য। এই আগুন লাগাবার একটা পদ্ধতি আছে। একটা শুকনো খড়ের নুড়ো তৈরি করে একজন শুকনো ঘাসের আগায় আগুন লাগাতে লাগাতে যায়, যতখানি জায়গা পোড়াতে হবে ততখানি জায়গাকে চক্রাকারে ঘিরে। আর কয়েকজন ছোট ডালপালা নিয়ে চক্রাকারে প্রজ্জ্বলিত ঘাসের পরিধির বাইরের দিকের আগুনটা পিটিয়ে নিভিয়ে দিতে থাকে যাতে আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে সারা বনকে না গ্রাস করে ফেলতে পারে, কেবলমাত্র যতখানি জায়গা পোড়াবার প্রয়োজন ততখানিটাই পুড়তে পুড়তে যায় ক্রমশ চক্রাকার

পরিধির ভিতরের দিকে এবং বৃত্তের ভিতরেই নিঃশেষ হয়ে থামে আগুন।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে আমার কাছে খবর এল পাণ্ড্রার কচি ঘাসে চরতে আসছে বাইসন, শিকারের সুযোগ উপস্থিত। পাণ্ড্রার কাছে রুদের ডাকবাংলায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সামনে দিয়ে বয়ে গেছে উত্তরবাহিনী কোয়েল। তার ওপারেই শুরু হয়েছে রাঁচি জেলার সীমানা। বনের ঢেউ দূরে বুলবুল পাহাড়ের কোলে মিশেছে, তিনহাজার চারশ' ফুট উচ্চ তার চূড়া। দক্ষিণে নেতারহাটের অভ্রভেদী চূড়া। নেতারহাটের উত্তর কোলে রুদের দুর্ভেদ্য বন দিনের আলোতেও ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার।

বাইসন শিকারের রীতি এই যে, হাঁকোয়া শিকারে মারা হয় না। পায়ে হেঁটে গিয়ে সবচেয়ে বড় মাথাওয়ালাটিকে শিকার করতে হয়। মেয়ে বাইসন বা অপ্রাপ্তযৌবন বাইসন শিকার নিয়মবিরুদ্ধ। ভোরের আলোতেই এদের শিকার প্রশস্ত, কারণ প্রখর দিবালোকে অরণ্যের গভীর গহনে এরা আশ্রয় নেয়।

শেষরাত্রে এসে আমায় শিকারে যাবার জন্য ডাকল ওখানকার রুদের শিকারী রামা ভোক্তা ও মনবাহাল। তখনই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক রামা ভোক্তা। পাতলা ছিপছিপে কচি বাঁশের মত নমনীয় দেহ, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর। এ বনের আনাচ-কানাচ গলিঘুঁজি তার নখদর্পণে, তাকে অনুসরণ করে চললাম। রাতের অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ় রয়েছে। আঁধারের উৎসবে তারার বাতি তখনও ম্লান হয়নি। মুরগির ডাক শুনে সময় অনুমান করে ডেকে এনেছে রামা। ভোর হতে তখনও বাকি আছে। গন্তব্য স্থান পাণ্ড্রার কিছু দূরে। পথের ধারে ঘাসের উপর বসে উষার অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। নিশীথের সুপ্তি ভঙ্গ করে শোনা গেল বাঘের "অ্যা-ও-ও···"। নিজের সাথীকে ডাকছে— বলল মনবাহাল। কাছেই ওর মান অর্থাৎ থাকবার গুহা। বাঘের

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকমের শব্দ এদের সুপরিচিত। এরা যে তাদেরই প্রতিবেশী।

অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে দেখে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ করে চলার পর দেখতে পেলাম দূরে পাণ্ডা নালার ওপারে কালো কালো অস্পষ্ট ছায়া। বাইনকুলার দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম বাইসনের মস্ত এক যূথ পাণ্ডার ধারের খোলা জায়গায় কচি ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে। এদের মারতে হলে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে হয় ওদের দৃষ্টির অন্তরালে। পাণ্ডার ধারে ধারে আমাদের পথ। শুকনো ডাল পাতা পথ থেকে আগেই সরিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিল, যাতে পায়ের নিচে শুকনো পাতার ক্ষীণতম খচ্‌মচ্‌ শব্দও না শিকারকে চকিত করে তোলে। পাণ্ডা নালাটি বেশ গভীর এবং এঁকে বেঁকে চলে গেছে তার গতিপথ। বাইনকুলার দিয়ে আগে দেখে নিলাম যূথপতি কোথায়, তারপর তার কাছে যাবার জন্য অতি সাবধানে পাণ্ডা নালার ভিতর দিয়ে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে কোনও ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুলে দেখে নিই, আবার এগোই। এমনিভাবে এগিয়ে যেখান থেকে তাকে বন্দুকের গুলির নাগালের মধ্যে পাব সেখানে আন্দাজ করে ধীরে ধীরে নালার থেকে উঠলাম। উঠেই দেখি সে তখন চরতে চরতে সরে গেছে কিন্তু আরও অনেকে আছে। পূবের আকাশ তখন ফরসা হয়ে এসেছে। ভোরের আলো আমার বন্দুকের ব্যারেলের উপর পড়তেই চক্‌চক্‌ করে উঠল, তাতে একটি বড় বাইসনের দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। সে "বাঁ-আঁ-আঁ" করে বিপদসূচক শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে যূথের সত্তর-আশিটি বাইসন চরা থেকে ক্ষান্ত হয়ে যে-যেখানে ছিল মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। প্রথম সংকেত যে দিয়েছিল সে খুব জোরে "কোঁঃ—" করে শব্দ করল এবং মাথা ঝাঁকানি দিয়ে আমার দিকে এগুতে শুরু করল। নিমেষের মধ্যে আমি তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম, মাথা নাড়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সে গুলি, কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেই বিরাট যূথ মাথা নিচু করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। এই-না দেখে আমার সঙ্গের শিকারীরা "ভাগিয়ে হুজুর, জান বাঁচাইয়ে" বলে নালায় নেবে দৌড়। আমি দেখলাম আর দেরি নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত আমার দিকে এগিয়ে আসছে প্রতিমুহূর্তে নিকট থেকে আরও নিকটে। বন্দুক তুলে সামনে যেটা বড় পেলাম তাকে এক গুলি, তার বিশাল দেহ পড়ে যেতেই আরেকটিকে, সে পড়তে ওরা তখন পিছন ফিরে দৌড়তে আরম্ভ করেছে। আরেক গুলি, দৌড়ে যাচ্ছে এমন একটিও পড়ে গেল। হুড়দাড় করে বাকিগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল বনের অন্তরালে। কেবল পড়ে রইল তিনটি প্রকাণ্ড বাইসনের মৃতদেহ। কেবল যূথপতি আমার হাত এড়িয়ে চলে গেল, তাকে আর শিকার করা হল না, এই ক্ষোভ রয়ে গেল।

সতেরো

চিতা—(১)

১৯১২ সাল। গিরিডি থেকে বদলি হয়ে সেটল্‌মেণ্টের কাজে গয়ার দক্ষিণ সীমান্তে এসে বাসা বাঁধলাম। শিকারে আমি তখনও শিক্ষানবীশ। নানা তীর্থগুরুর কাছে শিকারীর সাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করছি আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। শিকারের সুযোগ তখনও তেমন পাইনি, সখই বেশি। বড় বড় বনস্পতিবিহীন ছোট ঝোপঝাড়ের জঙ্গল, যাকে বলে বনছুলি, তার মাঝে বিক্ষিপ্ত অনুচ্চ কতকগুলি পাহাড় বনে ঢাকা, যার ওদেশী নাম ঘুটঘুরী। এই বনের রেশ গিয়ে মিশেছে দূর দক্ষিণের জঙ্গলে পাহাড়ে। সামনে অসমতল শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে এক একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের অধিবাসী চাষী গৃহস্থই বেশির ভাগ, তা ছাড়া আছে তাদের চাষের কাজ করবার জন্য দরিদ্র কামিয়া, ভুঁইয়া, মুসহর বহেলিয়া; যারা দিন আনে দিন খায়—পরোপজীবী। ছোট ছোট খড়ের ঘরে থাকে তারা, এত ছোট দরজা যে, দাঁড়িয়ে ঢোকা অসম্ভব, বসে ঢুকতে হয়। এ অঞ্চলে বড় বাঘের উপদ্রব কম। ভালুক, চিতা, বনছাগল (chinkara), চিত্রা হরিণ (spotted deer) এমন কি শম্বরেরও আশ্রয় এই সব ঘুটঘুরী। সামনের লোভনীয় শস্যক্ষেত্র বড়রা রাতের আঁধারে গা ঢেকে এবং ছোটরা দিনের যে কোনও নিরালা প্রহরে এসে শস্যে ভাগ বসিয়ে যায়। চিতা বাঘ এ অঞ্চলে প্রচুর। ফাঁক পেলেই ছাগল গরু এমন কি বলদও এদের মুখের গ্রাস হয়। এরা যখন মানুষখেকো হয়ে ওঠে, ভীত গ্রামবাসীরা তখন ভূত বলে তাদের পূজো দিতে আরম্ভ করে। দরিদ্র কামিয়ারা সাধারণতঃ ঘরের বাইরেই শোয়, গরমের দিনে তো বটেই, শীতের রাতও কেটে যায় চাবায় আগুন জেলে তার পাশে শুয়ে বা মাটির বোড়সিতে (মালসাতে) আগুন কাছে নিয়ে। ভগবান এদের প্রতি উদাসীন, মানুষ এদের প্রতি ফিরে তাকায় না,

মানুষখেকো চিতারাও এদেরই উপর করে অত্যাচার। নিশুতি রাতে ঘুমন্ত পল্লীর আনাচে কানাচে তারা চোরের মত ঢোকে এবং প্রথমেই যাকে ধরে তার হয় গলা নয় মুখটি কামড়ে ধরে জীবন শেষ করে, কোনও শব্দ করবারও অবসর দেয় না। সাধারণ শিকারে এ জাতীয় মানুষখেকো চিতা সহজে মারা পড়ে না, অথচ বন্দুক বা ধনুক পেতেও এদের মারা চলে না, কারণ বাঘ বা অন্য জন্তুর মত এদের কোনও নির্দিষ্ট আবাস নেই। রাতে যাকে মেরে খেয়ে গেল, দিনে সেখানে খেতে আসে না, এমন কি সে গ্রামেও আসে না। জঙ্গল, ঝোপ, ঝাড় গাছের উপর এমন কি নালা বা গর্তেও এরা লুকিয়ে থাকে বা বিশ্রাম করে। বন্য পশুই যাদের খাদ্য এবং গভীর অরণ্যচারী চিতারা বড় এবং পুষ্ট, এর নাম ওদেশীরা দেয় চিতোয়া বা সোনাচিতয়া। গ্রামের আসাচে কানাচে যে চিতারা ঘুরে বেড়ায় তারা হয় পাৎলা লম্বা, এদের বলে লব্‌মি। লোকেদের বিশ্বাস এ দুই আলাদা জাত, কিন্তু সেটা মানতে পারিনি।

কখনও কখনও লোকালয়ে চিতা ঢুকেছে টের পেলে গ্রামবাসীরা চারিদিক ঘিরে ফেলে যাতে না পালাতে পারে। লোকজন এবং তাড়া খেয়ে কোনও ঘরের ভিতর ঢুকলেই তার দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেয় তারা, তারপর সে ঘরের চালার উপর উঠে সেখানকার খাপরা সরিয়ে মারা হয়। আমার জানা, অনেকবারই এরকম করে চিতা শিকার হয়েছে।

আমার এক বন্ধু রায়বাহাদুর বিষুণদেও নারায়ণ সিংহ তখন লাতেহারে এস-ডি-ও। একবার এইরকম চিতা বাঘ ঘরে বন্ধ করা হয়েছে খবর পেয়ে গিয়ে ঘরের চালের উপর ওঠেন বন্দুক নিয়ে। খাপরা সরানর পর ঘরের ভেতর যথেষ্ট আলো পৌঁছানোর আগেই বাঘ এক লাফ দিয়ে তাঁর পা কামড়ে ধরে। সৌভাগ্যক্রমে কামড়টা পা পর্যন্ত না পৌঁছে পৌঁছয় তাঁর জুতার গোড়ালি অবধি। চিতা সেই জুতো নিয়ে মেঝেয় নামে। এই অতর্কিত আক্রমণে স্তম্ভিত

বিষুণদেওবাবু থতমত খেয়ে যান প্রথমটা, তারপর তাড়াতাড়ি খাপরার উপরে উঠে তিন চার জায়গার খাপরা একসঙ্গে সরান হয়। বাঘ ততক্ষণ উনুন ও হাঁড়িকুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, পরে তাকে গুলি করে মারেন।

এই হাজারিবাগ শহরে, যেখানে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলের বোর্ডিং, এই গরমের ছুটির আগেও ছিল, সেই সব বাড়িতে এক মেমসাহেব থাকতেন। তাঁকে স্থানীয় লোকেরা বলত কালী মেমসাহেব। ১৯২৭ সালের এক সকালে ভদ্রমহিলা সামনের দরজা খুলেই দেখেন তাঁর দোরগোড়ায় এক চিতা শুয়ে। তিনি তো তখনই দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁর বেয়ারা চাকররা জড় হয়ে হল্লা করায় বাঘ সেখান থেকে গিয়ে রাস্তার অপর পারে ঢোকে জাস্টিস সি. সি. ঘোষের কম্পাউণ্ডে এবং জানালা খোলা পেয়ে খালি বাড়ির ভিতরে। লোকজন তখনই দৌড়ে খবর দেয় কাছের পুলিশ ট্রেনিং কলেজে। সেখান থেকে, যেসব এ এস-পি'রা শিক্ষানবীশ ছিলেন, তাঁরা তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে আসেন এবং জানালা দিয়ে কয়েক গুলিতে বাঘটিকে মারেন।

বাঁশডিহার বন্ধু বাবু কালীপ্রসাদ সিংহের কাছে তখন শিষ্যত্ব নিয়ে শিকারের ট্র্যাকিং শিখছি। একদিন বনের ভিতর দিয়ে চলেছি, কালীবাবু, তাঁর অনুচর দলেলওয়া এবং আমি। বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার তাদের আপন আপন পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে। পথরেখায় রেখে গেছে নিজেদের পায়ের ছাপ। কালীবাবু আমাকে চেনাচ্ছেন, "এটা হচ্ছে শেয়ালের পায়ের দাগ, তা তো দেখেই বুঝতে পারছেন, কুকুরের পায়ের ছাপের মত ছাপ। এই যে শেয়ালের মতই পায়ের ছাপ কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন সামনের দু-পা বড় পিছনের পায়ের চেয়ে এবং নখের চিহ্নও পড়েছে, এটা হচ্ছে হায়নার পায়ের ছাপ। এই গোল গোল পাঞ্জা বাঘের পাঞ্জার মত কিন্তু আকারে ছোট, এ হচ্ছে চিতার। এ খুরের দাগ শুয়োরের" ইত্যাদি ইত্যাদি। নতুন শিকারী তখন আমি, কল্পনা তখন আমার বড় বাঘ পর্যন্ত পৌঁছয়নি, চিতা তাই বা কম

কি, সেও তো বাঘই বটে। কালীবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "এখানে চিতা পাওয়া যাবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মারবেন? তা আর কি আছে, কয়েকটা বক্‌রা (পাঁঠা) খাইয়ে দিলেই হবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি রকম? তাতে তিনি বললেন, "সারাদিন বনের কাছাকাছি ছাগল চরাবার বন্দোবস্ত করব এবং ঘরে ফেরার সময় তাদের একটিকে সেখানে বেঁধে রেখে যাবো। চিতা সেই সাড়া পেয়ে ও দেখে তার লোভ জাগবে, কিন্তু দিনের আলোতে কাছে আসতে সাহস করবে না, কাছাকাছিই লুকিয়ে থাকবে। সন্ধ্যার পর ছেরচরওয়া (যে ছেলেটি ছাগল চরায়) সব ছাগল নিয়ে ঘরে ফিরবে। একটি শুধু থাকবে পড়ে বাঁধা অবস্থায়। তাকে পড়ে থাকতে দেখে বাঘ মনে করবে ওটা বুঝি রয়ে গেছে, রাত হতেই এসে তাকে ধরবে। এমনি দু-একদিন হলেই চিতার লোভ বেড়ে যাবে, সে আনাচে-কানাচেই থেকে যাবে। লোভে লোভে রোজই দেখে যাবে এদিকটা, তারপর একদিন পাঁঠা বেঁধে বসলেই সে যেই নিঃশঙ্ক হয়ে এসে ধরবে অমনি তাকে শিকার করা যাবে।"

চিতাকে ওরকম অভ্যাস করাবার মত আমার ধৈর্য মানল না। কথা হল পরদিনই শিকারে আসব। কালীবাবু দলেলওয়াকে বললেন, "এখানে ডিপ্টি সাহেব চিতা মারবেন, শিকারের সব বন্দোবস্ত করে দিবি।"

আমায় সংবাদ পাঠালেন, সব প্রস্তুত, আপনি চলে আসুন। বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে চলে গেলাম। জন্তু-জানোয়ারের পায়ে-চলা পথের ধারে প্রকাণ্ড ন্যাড়া দুটো পাথরের চাঙড়। তারই একটির গায়ে একটা শালগাছকে গোড়া থেকে সদ্য কেটে এনে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে, যেন ওটা ওখানেই জন্মেছে। এমন কি যেদিকে তার সাধারণত রোদ পেত সেদিকটি এখানেও রোদের দিক করে রাখা হয়েছে। গাছ লাগাবার এই কায়দা বা মাচায় পাতা দেবার রীতি (পাতেড়না) দলেলওয়াই প্রথম শিখিয়ে দিল। কাটা শাল গাছটির

সঙ্গে দুচারটি ডালপালা দিয়ে পাথরের চাঙড়ের উপর এমন একটা অন্তরাল তৈরি করা হয়েছে যেখানে বসে স্বচ্ছন্দে আত্মগোপন করা চলে, সেখানে গিয়ে বসলাম। আমাদের কাছে প্রায় পঁচিশ ফুট সামনে পথের উপর বনকুলের ঝোপের সঙ্গে একটি পাঁঠা বাঁধা, আশেপাশে বাকিগুলি চরে বেড়াচ্ছে।

সূর্যাস্তের পর যারা ছাগল চরাতে এনেছিল তারা ছাগলগুলিকে নিয়ে ফিরে চলল গ্রামের পথে। যে ছাগলটি বাঁধা ছিল, দলের সব যাচ্ছে দেখে সেও যেতে চেষ্টা করল প্রাণপণে, কিন্তু সে যে বাঁধা, ঘরে ফেরার পথ তার রুদ্ধ। সে ডাকতে শুরু করল। যখন দেখল তার ডাক উপেক্ষা করে তার দলের আব সবলে দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে তখন গলা ফাটিয়ে আকুল ক্রন্দনে মুখরিত করে দিল চারিদিক, "আমায় ফেলে যেও না, আসন্ন মৃত্যুর হাতে আমায় সমর্পণ করে যেও না তোমরা" এই যেন তার আপন ভাষায় বলতে চাইল।

আমার বিবেক কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "এ কি করছ, নিরীহ জীবকে হাত-পা বেঁধে মৃত্যুর কবলে ফেলে দিয়ে শিকার, এই কি পৌরুষ?" কিন্তু শিকার করব বলে এসেছি, ফিরে গেলে যে চিত্তদৌর্বল্যের পরিচয় দেওয়া হবে। আমার হাতে তো বন্দুকই আছে, না না, ওকে আমি মারতে দেব না, তার আগেই চিতাকে মেরে ফেলব, নিজেকে এই বলে আশ্বাস দিলাম বারবার।

রাত গভীর হয়ে আসে। পাখীরা অন্ধকার হতেই আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের নীড়ে। বন্যপশুও আত্মরক্ষা করেছে তাদের নিরাপদ স্থানে, শুধু সামনে দাঁড়িয়ে ছাগলটি বাঁধা। ভয়ে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে। দেখছি মাঝে মাঝে তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসছে। আমিও সমস্ত চেতনা জাগ্রত করে অপেক্ষা করে আছি। মনের ভিতর চলছে বিবেক ও শিকারস্পৃহার দ্বন্দ্ব। মনে মনে শুধু এই কামনা করছি ছাগলটির কাছে পৌঁছনোর আগেই যেন চিতা আমার দৃষ্টিপথে পড়ে। হঠাৎ দেখি বনের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে ছাগলটির দিকে এগিয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক চিতা। বিদ্যুৎবেগে তুলে নিলাম আমার বন্দুকটি, তার ক্ষিপ্রগতিতে সে এগিয়ে আসছে, এসে পড়তে তার বিলম্ব হবে না, চঞ্চল চিত্তে এক গুলি। শব্দে চিতা এক লাফে অদৃশ্য, গুলি তার লাগল না কিন্তু ছাগলটি যে বেঁচে গেল তাতে একটা মহা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। শুধু মাত্র তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে হাতে আসা চিতা পালিয়ে গেল, সেজন্য দুঃখ হল না তা নয়, তবে অন্তরের স্বস্তি তার উপর ছাপিয়ে রইল।

আঠারো

চিতা—(২)

কালীবাবুর সঙ্গে চিতার অভিজ্ঞতা। কিছুদিন পরই পত্তই গ্রামের জমিদার বীরেন্দ্রবাবু আমন্ত্রণ জানালেন চিতা শিকারের। গয়ার দক্ষিণ আওরাঙ্গাবাদ মহকুমার পত্তই বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে অনেক ভেঁড়িহারের (মেষপালক) বাস। বীরেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণে সেখানে যেতেই তিনি সানন্দে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। গ্রামের দক্ষিণে একটি ন্যাড়া পাহাড়, মস্ত মস্ত পাথরের চাঙ্গড় সাজিয়ে স্তূপীকৃত হয়ে আছে, তাতে অসংখ্য গুহা কন্দর। এই পাহাড়গুলির দক্ষিণ পাদদেশ থেকে চলে গেছে ঢালু, তার কোথাও কোথাও আবাদী ক্ষেত। এই পাহাড়ের পাদদেশেই দক্ষিণে আমবাগান এবং মাটির দেওয়াল খাপরার চাল একখানি ঘর, বীরেন্দ্রবাবুর পাকাপাকি শিকারের আস্তানা। বীরেন্দ্রবাবু এইখানে আমাকে নিয়ে গেলেন। পূব-মুখো ঘরখানি, তার মেঝেয় মস্ত ফরাস পাতা। ঘরের উত্তর দেওয়ালে দুটি ফুটো, যেখান দিয়ে শিকার করা হয়। ফুটো দিয়ে দেখা যায় পাহাড়টি এবং সামনেই খুঁটিতে বাঁধা কালো একটি পাঁঠা। তার আশেপাশেই অজস্র ছাগল ভেড়া চরছে।

বীরেনবাবু বললেন, "খানিক দূরে যেসব বন আছে তা থেকে মাঝে মাঝে চিতা এসে আশ্রয় নেয় এই পাহাড়ের গুহায় কন্দরে এবং আশেপাশে যেসব ছাগল ভেড়া চরে তাদের ধরে খায়। এমনি যখন লোভে পড়ে, তখন কয়েকদিন থেকে যায় এখানে লোভে লোভে। সেই রকম সময়েই পাঁঠা বেঁধে আমি কবার শিকার করেছি। এবারও এরকম এসেছে, খবর পেয়েই আপনাকে খবর দিয়েছি এবং এদিকে ছাগল চরাতে পাঠাচ্ছি কদিন ধরে তাদের লোভ উদ্রেক করতে। বিকালে চিতা এসে পাহাড়ের মাথায় ওই পাথরটির উপর বসেছিল সতৃষ্ণ নয়নে··· এদিকে তাকিয়ে সন্ধ্যার অপেক্ষায়। একটু আগেও তার

মাথা দেখা যাচ্ছিল ওখান থেকে। অন্ধকার হলেই সে আসবে নিশ্চয়ই।”

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে আসতে ছাগল ভেড়া নিয়ে যারা চরাতে এসেছিল, তারা চলে গেছে গ্রামে। ম্লান জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে কালো ছাগলটিকে আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান। তার সব আর্তনাদ ডাকাডাকি থেমে গেছে অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে, ত্রাসে। আমিও বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত, আজ এলেই শিকার করব। মৃত্যুভয়ে কম্পমান পাঁঠাটিকে দেখে বড়ই গ্লানি অনুভব করতে লাগলাম। মনের ভিতর বয়ে চলেছে কত চিন্তার ধারা। নেশা এমনই জিনিস যে, সে যখন কাউকে পায়, পায় তার আয়ত্তের ভিতর, তার ন্যায়-অন্যায বিচারবোধকে দেয় আচ্ছন্ন করে। দৃঢ়মুষ্টি থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুবই শক্ত। মাতাল প্রতিদিনই প্রতিজ্ঞা করে মদ সে স্পর্শ করবে না, কিন্তু যখনই আসে নেশার সময় তার সংকল্প ব্যর্থ হয়ে যায়। অনাহারক্লিষ্ট স্ত্রী-পুত্র আপনজনের মুখের গ্রাস, শেষ সম্বল ছিনিয়ে নিয়ে সমর্পণ করে নেশার বেদীতে। শিকারও তেমনিই নেশা। মানুষের সহজাত করুণা মমত্ববোধ তার কোমল অনুভূতিগুলিকে অতিক্রম করে জাগিয়ে তোলে উত্তেজনাপূর্ণ উন্মাদনা, শিকারে সাফল্যলাভের তীব্র স্পৃহা। বিবেক এসে বাধা দেয়, কিন্তু ক্রমশঃ মন কঠিন হয়ে আসে, সে বাধা জোর পায় না।

হঠাৎ এক আর্ত চীৎকার “ম্যা—” তারপরই ছাগলটি লুটোপুটি খেতে লাগল মাটিতে। আমিও ক্ষিপ্রহাতে তুলে নিলাম বন্দুক। নিয়ম হচ্ছে চিতা এসে ছাগল মারবে, তারপর নিশ্চিন্তে বসে তাকে খেতে থাকবে, তখন ধীরে সুস্থে তাকে দেখে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করা। কিন্তু মন তখনও অতটা নিরপেক্ষ ও কঠিন হয়ে যায়নি। পাঁঠাটিরও অসহায় মৃত্যু দেখে তখনই বন্দুক তুলে আর কোনও অবসর না নিয়ে আবছা অস্পষ্ট আলোতেই এক গুলি করলাম। লক্ষ্যচ্যুত গুলি এনে দিল ব্যর্থতা।

মাসখানেক কেটে গেছে। গয়ার ভালুয়ারী গ্রামে আমার ক্যাম্প। সারাদিন কাজ পরিদর্শন করে শ্রান্ত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে ঘোড়া থেকে নামতেই কয়েকজন গ্রামবাসী এগিয়ে এল "হুজুর এখনই শিকারে যেতে হবে, চিতা একটা গরু মেরেছে ভারি সুবিধামত জায়গায়।" সারাদিনের শ্রান্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিমেষে সব চলে গেল শিকারের নামে। তখনই বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাদের সঙ্গে।

গ্রাম ছাড়িয়ে কিছু দূরে জঙ্গল; সেই জঙ্গলে কিছুদূর গিয়ে বনে ঢাকা একটি পাহাড়। পাহাড়ের শিখর থেকে একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড সুদূর অতীতে স্থানভ্রষ্ট হয়ে গড়িয়ে নেমে এসে পাহাড়ের দক্ষিণ পাদমূলে থমকে দাঁড়িয়েছে ঈষৎ পূবদিকে হেলে। প্রায় বারো ফুট উঁচু খাড়া সেই উপলখণ্ডের গায়ে একখানা বাঁশের সিঁড়ি গ্রামবাসীরা লাগিয়ে রেখেছে। তাই দিয়ে বেয়ে উঠে দেখি উপরটা বাটির মত, তার ভিতরে বসে আত্মগোপন করবার মত চমৎকার জায়গা। এই প্রস্তর

খণ্ডটি থেকে প্রায় দশ-বারো হাত উত্তরে আরেকটি খণ্ড, ওটির চেয়ে আকারে কিছু ছোট, তার উপরটা চোখা। এটির ঠিক পশ্চিমেই পড়ে আছে মরা গরুটি। স্থির করলাম একাই বসব, কিন্তু সঙ্গী যারা ছিল তাদের মহা আপত্তি তাতে। "রাত্রে অজানা জঙ্গলে আপনি পথ চিনে ফিরবেন কি করে? ধরুন আমরা যদি ঘুমিয়েই পড়ি, আপনার ডাক নাই শুনতে পাই। এ আমাদের জানা, সাহসী লোক, একে কাছে রাখুন।" শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হল।

পাথরের উপর বাটির মত গর্তে আমি একজন গ্রামবাসীকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলাম। অন্য যারা এসেছিল চলে গেল। চারিদিকে নেমে এসেছে রাতের স্তব্ধতা। চাঁদ আমাদের পিছনের আকাশে, তাই পাশের প্রস্তরখণ্ডটি তার কালো ছায়া ফেলছে মরা গরুটির উপর। নিশুতি রাতে স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করছি, মাথা উঁচু করলেই পাথরের কানার উপর দিয়ে দেখতে পাই গরুটিকে, আবার মাথা নিচু করলেই অদৃশ্য। বহুক্ষণ অপেক্ষায় নিরাশ হয়ে পড়ছি, আজ আর সে আসবে না, এমন সময় মরা গরুটির কাছে পাথরের ছায়ায় কি যেন চলমান, দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখি নিঃশব্দে চিতা এসে সবে খেতে বসেছে। আমিও উল্লসিত হয়ে বন্দুকে হাত দিতেই আমার সঙ্গীও উৎসুক দৃষ্টিতে উঁচু হয়ে দেখল, দেখেই তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। ক্রমে তার গলা শুকিয়ে কাঠ। বন্দুক তুলেছি এমন সময় তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল খক্ খক্ খক্ কাশী। হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেল, চিতা অদৃশ্য। নিষ্ফল বিরক্তি, ক্রোধ ও নৈরাশ্যই সার হল সেদিন।

আরও কিছুদিন কেটে গেছে, গয়ার বেরনা বালুগঞ্জে আমার ক্যাম্প। কাছেই বনাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড পাহাড়। তার মাঝামাঝি থেকে এক মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া সমতল শীর্ষ আরেকটি পাহাড়ের ধাপ, পাহাড়ের পূব-উত্তর গা দিয়ে নেমে এসেছে। আরও পূব-উত্তরে পাহাড় জঙ্গল। মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা ঝোপে-ঝাড়ে ভরা।

এই সমতল মাথাওয়ালা পাহাড়টির চারিদিকে সোজা খাড়াই, একদিকে খানিক ঢালু, যেখানে-সেখানে ওঠা-নামার কয়েকটি পথ আছে। স্থির হল এই পাহাড়ে একদিন শিকারে যাব। এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে গেলাম একাই বসব। হাঁকোয়া শিকার। হাঁকোয়ারা বড় পাহাড়টির সংযোগস্থল থেকে চারিদিক ঘিরে হাঁকোয়া করে আসছে পাহাড় থেকে। সেই ওঠা-নামার পথের দিকে এবং পথের উপরেই বাঁধের উপর আমি বসেছি। আমার দুপাশে স্টপেরা লুকিয়ে আছে। হাঁকোয়ারা দুইয়ে চারে অথবা দলবদ্ধভাবে তাদের নির্দিষ্ট জঙ্গলটুকুর হাঁকোয়া শেষ করে পাহাড়ের খাড়া ধারে এসে পৌঁছতে লাগল। যারা পেছিয়ে ছিল তারাও তাড়াভাড়ি করে উপর থেকে মনোহর দৃশ্যের এবং ডিপ্‌টি সাহেব কি করে শিকার করেন দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আগে যারা ধারে পৌঁছেচে তাদের আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে আসতে লাগল এবং সামনেই অপর হাঁকোয়া যারা আরও পেছিয়ে আছে তাদের সঙ্গে হাঁকোয়ার চিৎকারে যোগ দিতে লাগল। আমি দেখলাম বাঘ তো এলই না অথচ এদের সমবেত চিৎকারে রীতিমত বিরক্তই বোধ হতে লাগল। কিন্তু আশার এমনি মোহ যে জঙ্গলটুকু নিঃশেষে হাঁকোয়া না হলে ভরা বন্দুকের গুলি বের করে নিতে পারি না। এমন সময় আমার ডান দিকের হাঁকোয়ারা যারা তখনও পাহাড়ের উপর, তারা জনকয়েক চিৎকার করে উঠল, "বাঘ যা ত হ্যায়, বাঘ যা-ত হ্যায়।" তাদের বলার আগেই আমার দৃষ্টিপথে এক প্রকাণ্ড কুঁদো চিতা বাঘ ঝোপ থেকে ঝোপের অন্তরালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে আসছিল। কিন্তু, উপরের হাঁকোয়াদের "বাঘ যা-ত হ্যায়" শুনে প্রায় আড়াইশো তিনশো হাঁকোয়ারা "বাঘ যা-ত হ্যায়" সমবেত ধ্বনিতে বাঘকে সচকিত ত্রস্ত করে তুলল। স্টপ যারা ছিল তারাও উৎসাহের প্রাবল্যে "উহে হ্যায়, উহে যা রহা হ্যায়, উহে হ্যায়, মারিয়ে" ইত্যাদি নানারকম কর্ণভেদী চিৎকার আরম্ভ করল, যেন তারা না দেখালে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। যদিবা বাঘ পিছনের হাঁকোয়াদের চিৎকারেও

নির্দিষ্ট পথে আসছিল, স্টপদের এই সোরগোল চিৎকারে খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ল্যাজ সোজা করে উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালাল, আমার থেকে বহু দূর দিয়ে। শিকারীদের উৎসাহের আতিশয্যে এবারও শিকার নিষ্ফল হল।

সেবারকার ক্যাম্প শেষ হওয়া পর্যন্ত সে যাত্রায় গয়াতে আমার চিতা শিকার আর হল না, হল শুধু বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

উনিশ

চিতা—(৩)

চিরবহমান কালের প্রবাহে পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই পাঁচ বছর কত স্মৃতিই রেখে গেছে, দিয়ে গেছে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। গয়া সেট্‌ল্‌মেণ্টের কাজ শেষে বেতিয়া সেট্‌ল্‌মেণ্ট, তারপর রাঁচি ও ধানবাদ ঘুরে আবার এসেছি ছোটনাগপুর সেট্‌ল্‌মেণ্টের কাজে। ইতিমধ্যে বাঘ বড় ও ছোট কয়েকটিই শিকার করেছি।

১৯১৭ সাল। পালামৌর পাটন থানার কাছেই আমার ক্যাম্প। পাটন থানার ঠিক উত্তর থেকে বহুদূর বিস্তৃত পাহাড় জঙ্গল। এখানে ভালুক চিতাই বেশি। মাঝে মাঝে বড় বাঘও আসে। হরিণ এবং অন্যান্য শিকারোপযোগী জন্তু জানোয়ারও প্রচুর। একদিন খবর পেলাম যে পাঁড়েঠাকুর রামের গ্রাম সগুনার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট একটু জঙ্গলের ধারে বাঘে বলদ মেরেছে। তখনই দেখতে চলে গেলাম সেখানে। গিয়ে সব পরীক্ষা করে দেখলাম চিতায় মারা, বড় বাঘের নয়। কাছে কোনও বড় গাছ ছিল না। ঘুটঘুরী ও নলবনের প্রান্তে কতকগুলি ক্ষেত ধাপে ধাপে নেমে গেছে। তার আলের উপর মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড। বলদটিকে মেরে একটি শূন্য ক্ষেতের উপর ফেলে রেখে গেছে! সাবা করবার উপযোগী কোনও গাছ নেই। দেখে স্থির করলাম যেখানে বলদটি পড়ে আছে তার নিচের দিকের একটি ক্ষেতের আলের উপরকার কুলের ঝোপকে সামনে রেখে নিচু ক্ষেতটিতে গলা সমান গর্ত খুঁড়ে তার ভিতরে দাঁড়াব, যাতে আলের ওপর ঝোপের ভিতর দিয়ে আমার দেখা চলবে। সেই মত সব বন্দোবস্ত করতে বলে এলাম লোকজনদের।

সন্ধ্যায় আমার প্লেন বারো বোরের বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে সেই গর্তের মধ্যে পশ্চিম-মুখো হয়ে দাঁড়ালাম। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তার এক ধাপ উপরের ক্ষেতে মড়িটি পড়েছিল। দূরে জঙ্গলের প্রান্ত।

জ্যোৎস্না রাত। চুপ করে বসে আছি, এই আসে এই আসে, আশায়। একবার মাথা উঁচু করে দেখতেই চোখে পড়ল মড়িটার উপর কি যেন একটা জানোয়ার লাফিয়ে উঠল, তার মাথা এবং ঘাড় মড়ির ওপাশে ফোলা পেটের উপর নিয়ে দেখা যাচ্ছে। তখনও খেতে শুরু করেনি। তারপর যতদূর সম্ভব নজর করে দেখলাম চিতাই বসে খাচ্ছে। একটু ছোট মনে হচ্ছে, চিতাই তো? হ্যাঁ তাই। বন্দুক তুলে স্থির করে একটি গুলি। আজও মনে পড়ে রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে শব্দ পেলাম পাই-ই-ই করে গুলিটা পার হয়ে চলে গেল, যাকে লক্ষ্য করে মারলাম সে পড়ে গেল। উঠে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি

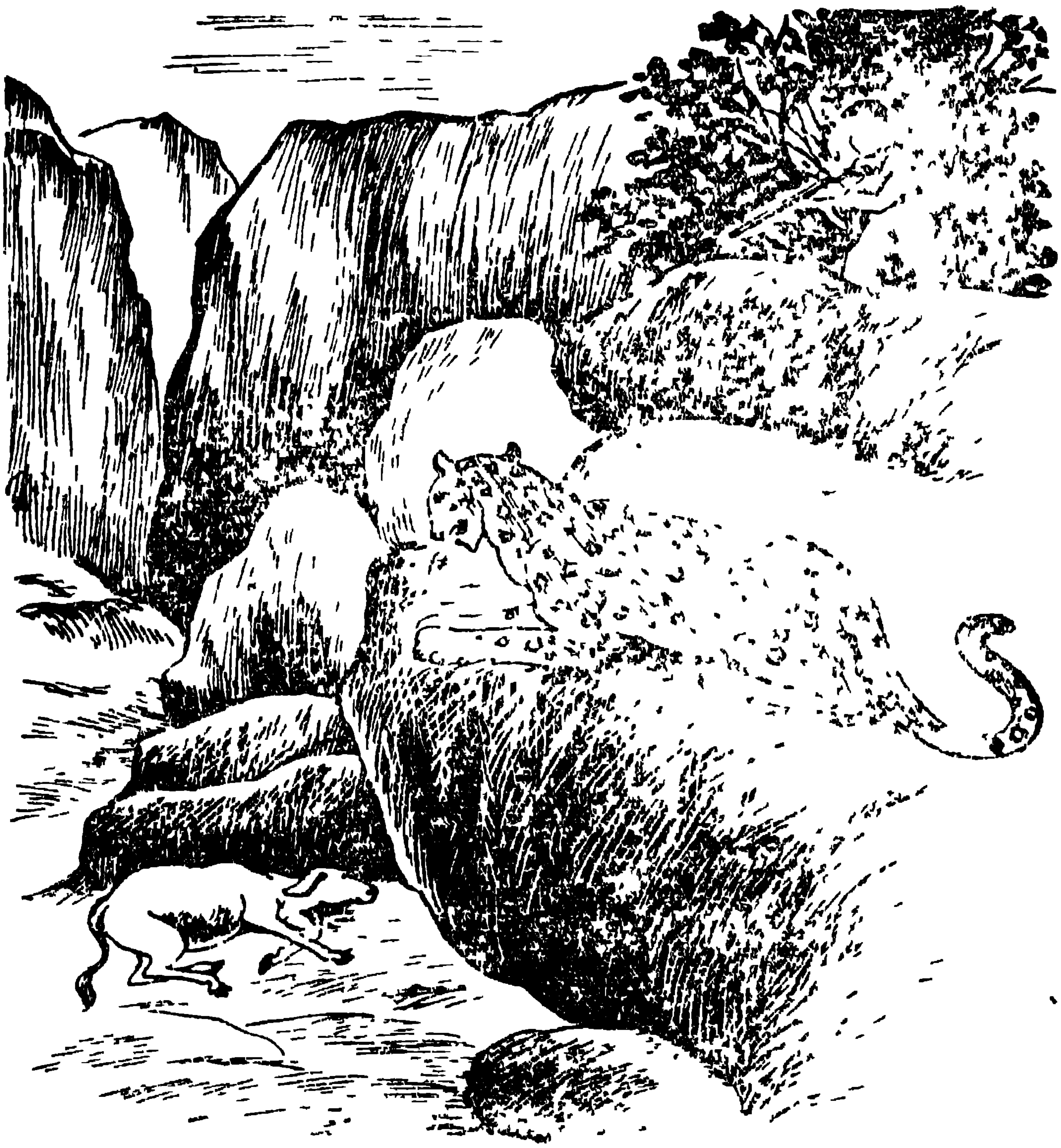

চিতা নয়, মস্ত এক কুঁদো বন বিড়াল। গুলি তার দেহ এপার ওপার হয়ে চলে গেছে। তার ক্ষুদ্র দেহ গুলির প্রচণ্ড গতিবেগকে রোধ করতে পারেনি, ওর দেহের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গুলি তার স্বাভাবিক গতিতে চলে গেছে। কিন্তু কি করে কি হল ? ভাবতে লাগলাম, বিড়াল কি করে আমার চোখে চিতার মত দেখাল। জন্তু জানোয়ার বা যে-কোনও জিনিসকেই আমরা সাধারণতঃ সোজা সামনে দেখতে অভ্যস্ত এবং সেইভাবেই তাদের পরিমাপ দেখতে অভ্যস্ত। উপব থেকে যখন দেখি তখন সেই জিনিসই মাপে ছোট বা খাটো দেখায়, কিন্তু নিচের থেকে দেখতে গেলে দেখায় বড়। আমি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে (position) গর্তের ভিতর থেকে মাটির সমরেখায় আকাশের পটভূমিকায় দেখছিলাম, তাই এই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। এ একটা মস্ত শিক্ষা হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পর পাটন থেকে পশ্চিমে সুরুমা গ্রামে আমার অস্থায়ী আবাস স্থাপন করলাম। একদিন সকালে পাটন চলেছি ঘোড়ায় চড়ে। সেখানে কিছু কাজ আছে তাই সেরে আসতে। পথে পাটনের কাছে পশ্চিম-উত্তর কোণে পাহাড়-জঙ্গলের মাঝে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম জোঁড়া-জোঁড়। পার হবার সময় চোখে পড়ল একটি ঘিসিয়ারি (ঘাসের উপর দিয়ে ভারি জিনিস টেনে নিয়ে যাবার দাগ) গ্রাম থেকে বনের দিকে চলে গেছে। দেখেই কৌতূহল হল কোন জানোয়ার কি নিয়ে গেল গ্রাম থেকে। হয় বাঘ নয় চিতা হবেই। ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গের লোকজনদের মধ্যে থেকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘিসিয়ারি অনুসরণ করে বনের দিকে চললাম। সঙ্গের অন্যান্য লোকজনদের বললাম গ্রামে গিয়ে সন্ধান নিতে কি ব্যাপার। ঘিসিয়ারি অনুসরণ করে প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাইল আন্দাজ গিয়ে দেখি অল্প জঙ্গলের মধ্যে একটি মরা বাছুর ঝোপের নিচে পড়ে রয়েছে। কাছেই একটি ঘুটঘুরী। পায়ের চিহ্ন ও গায়ে দাঁতের দাগ দেখে বুঝলাম চিতার কাণ্ড। ওকে সন্ত ওখানে

রেখে চিতা সরে গেছে। ইতিমধ্যে আমার যে লোকেরা গ্রামে সন্ধান দিতে গিয়েছিল তারা এসে গেল। তারা গিয়ে দেখে গ্রামের এক গোয়ালঘর থেকে ঘিসিয়ারির আরম্ভ। বেশ বড় গোয়ালঘর। মাটির থেকে সাত-আট ফুট উঁচু দেওয়াল, তার উপর হাত খানেক হাত-দেড়েক ফাঁক, তার উপর চালা। চিতা লাফিয়ে দেওয়ালের উপর উঠে, দেওয়াল ও চালের এই ফাঁকের ভিতর দিয়ে গোয়ালের ভিতরে ঢুকেছে ও একটি বাছুব মেরে সেটিকে মুখে করে লাফিয়ে আবার দেওয়াল পেরিয়ে বেরিয়ে মাটির উপর দিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। সকাল তখন সাতটা। যার গোয়াল সে তখনও জানে না যে চিতা তার বাছুর নিয়ে গেছে। অত গরু-বাছুরের মধ্যে তার খোঁজ তখনও পড়েনি।

স্থির করলাম চিতাটিকে শিকার করব। সঙ্গের লোকজনেদের বললাম, তোরা এখানে পাহারা দে, চিল শকুন এবং চিতা এসে না খেতে পারে, আমি কাজ সেরেই আসছি। সোজা পাটন গিয়ে সেখানকার কাজ সেরে সুরুমা ক্যাম্পে ফিরে সেখানকার কাজও শেষ করে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলাম যখন. বেলা তখন প্রায় সাডে তিনটে। কাছেই পাহাড়ের কোলের কাছে কতগুলি বিরাট বিরাট পাথরের চাঙ্গড় পড়ে, তারই কাছে মড়ি। লোকজন যারা পাহারায় ছিল তারা এমনি একটি ন্যাডা পাথরের চাঙ্গড়ের উপর আমার বসবার জায়গা করেছে। একটি গাছ পাথবটির গা ঘেঁসে উঠেছে, তারই গায়ে, তাজা কেটে আনা কতকগুলো ডালপালা সাজিয়ে আমার বসবার জায়গা। ডাল-পাতাগুলি এমনভাবে নিচু করে সাজিয়ে বাঁধা যাতে নিচের থেকে চিতা আমায় দেখতে না পায়। আমি তার উপর গিয়ে বসলাম এবং লোকজন সব চলে গেল।

সামনে আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট আন্দাজ দূরে পড়ে মৃত বাছুরটি। আমার চারশ'-পাঁচ রাইফ্‌লটি সামনে রেখে মড়ির দিকে নজর রেখে চুপ করে বসে আছি। মিনিট পনর কুড়ি কেটে গেছে।

হঠাৎ আমার পাশে একটা খুব মৃদু শব্দ শুনলাম। মাথা না ঘুরিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখি আমার কাছ থেকে পনর ফুট আন্দাজ দূরে পাঁচ ফুট আন্দাজ উঁচু একটি পাথরের চাঙড়ের উপর হৃষ্টপুষ্ট প্রমাণ মাপের একটি চিতা পিছনের আরেকটি উচ্চতর পাথর থেকে লাফিয়ে নেমে সবে বসছে। আমাদের মাঝে কোনও রকম আবরণ বা অন্তরাল নেই। যে কোনও মুহূর্তে সে আমাকে দেখতে পারে। কিন্তু তার সমস্ত মনোযোগ তখন মড়িটির উপরে নিবদ্ধ। সেই সকালে রেখে গেছে, এতক্ষণ লোকজনের সাড়া পেয়ে আসতে পারেনি। ক্ষুধার্ত লোভাতুর দৃষ্টিতে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মড়িটির দিকে। ক্রমে সে সামনের দু-পা মেলে নিচু হয়ে বসল। বেলা আরেকটু পড়ার অপেক্ষায় তার শিকার পাহারা দিচ্ছে। আসন্ন ভোজের আনন্দে মসগুল। পিছনের ল্যাজটিকে আস্তে আস্তে বেঁকাচ্ছে ও সোজা করছে। শ্বাস রুদ্ধ করে বসে আছি কোন রকমে, নড়লেই পড়ে যাবে ওর দৃষ্টি আমার উপর। সে নিচু হয়ে বসতেই আমার সামনের পাতার অন্তরাল এসে গেল তার চোখ ও আমার মাঝে। চট করে বন্দুক তুলে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভিতরে লক্ষ্যস্থির করে গুলি করলাম। লদ্ করে তার দেহ উল্টে পড়ল পাথরের উপর থেকে, আমার soft-nosed expanding bullet তার কাঁধের ডান দিক দিয়ে ঢুকে ওপারের বাঁ দিকের সাত ইঞ্চি চামড়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

কুড়ি

মা

স্মৃতি ও অনুভূতি জীবনের পরপারে মানুষের সহগমন করে কিনা জানি না, তবে এ জীবনে তারা এনে দেয় মধুরিমা ও তীব্র আত্মগ্লানির জ্বালা আমাদের সুকৃতি এবং ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত ভুল-ভ্রান্তি দুষ্কৃতির প্রতিদানে। আমার শিকার-জীবনের দু-একটি এমন ঘটনার কথা মনে পড়ে যার কালো দাগ কালের প্রবাহে এতটুকুও ধুয়ে গেল না মানসপট থেকে আজও। এ কাহিনী তারই একটি।

পালামৌ জেলার লেসলীগঞ্জে তখন আমার ক্যাম্প। ১৯১৭ সাল। ছোটভাই বিনয় এসেছে আমার কাছে গ্রীষ্মের ছুটিতে। ঠিক হল একদিন তাকে নিয়ে শিকারে যাব। শৈশবে তার বন্দুকের শব্দে বড় ভয় ছিল। সে-বছর পুজোর সময় বাড়ির সকলে দেশে গেলেন পুজো উপলক্ষে, কেবল রাঁচীর বাড়িতে রইলাম আমি। সামনে ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা বলে কাছে রাখলাম আমার ছোট ভাইটিকে, তাকে শিকার শেখাব এই আশ্বাস দিয়ে। তখন সে ছোট বালক মাত্র। শহর ছাড়িয়ে মোরাবাদীর বিস্তৃত ঘোড়দৌড়ের মাঠের গায়ে আমাদের বাড়ি। একদিন নির্জন মধ্যাহ্নে দেখি মাঠের মাঝে চিল বসে আছে। বন্দুক তৈরি করে নিয়ে ছোট ভাইকে ডাকলাম, "খোকা শিকার করবে এসো।" নিশানা সব ঠিক করে তাকে কি করে কি করতে হবে বলে এবং দেখিয়ে দিলাম। বন্দুকের ঘোড়া টিপতেই চিল উলটে পড়ে গেল এবং সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল সে "মার দিয়া"। সেই যে তার আত্মবিশ্বাস এসে গেল, তারপর মোরাবাদীর আস-পাশের কত ঘুঘু এবং চাহা যে তার বন্দুকের লক্ষ্য হয়ে প্রাণ হারালো তার সংখ্যা নেই। ক্রমে সে বাঘ ভল্লুক চিতা হরিণ সব রকম শিকারই করেছে এবং কালে খুব নামী শিকারী হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। আত্মবিশ্বাস এমনি জিনিস।

১৯১৭ সাল। আমার কাছে যখন এসেছে সে তখন বয়স তার কৈশোরের শেষপ্রান্তে, সবে কলেজে পড়ে। লেসলীগঞ্জ ইনস্‌পেকশান বাংলোর পাশাপাশি দুটি ঘরে থাকি আমি ও আমার সহকর্মী শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমরা কেস-ওয়ার্ক করি। আমার একটি স্থানীয় ভুঁইয়া শিকারী ছিল। তাকে পাঠালাম জঙ্গলের কোথায় শিকার আছে সেই সন্ধানে। সে এসে সংবাদ দিল তেত্রায়েন গ্রামের যে বন সেখানে একটা উৎস আছে যেখানে জল খেতে সব জানোয়াররা আসে।

বেশ বেলা থাকতে থাকতে আমরা গেলাম সেখানে শিকারের সন্ধানে। আমরা দুই ভাই এবং নগেন। তিনদিকে পাহাড় ঘেরা, তারই কোলে উৎসটি আর উৎসারিত জল জমে একটি জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে, তারই কিনারায় মাটিতে বসলাম আমরা কিছু দূরে দূরে। বিকেল ক্রমে সন্ধ্যায় পৌঁছল, সন্ধ্যার আলোও মিলিয়ে এল রাতের আঁধারে। কিন্তু আমাদের প্রতীক্ষা সফল করতে কোন জানোয়ারের দেখা মিলল না। ও পাশের পাহাড়ের মাথায় শোনা গেল "অ্যাঁ·· ও···"। বাঘ তখন হাই তুলে ঘুম থেকে উঠে শিকার-অন্বেষণে বেরোচ্ছে, এ তারই স্বর। একবার পায়ের শব্দে প্রস্তুত হয়ে চেয়ে দেখি শেয়াল তার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাইতে চাইতে জল খেতে আসছে; নিরাশ হয়ে বন্দুক নামিয়ে রাখল ওরা, ওপাশে বিনয় ও নগেন। বৈদ্যুতিক টর্চের প্রচলন হয়নি সে যুগে, তাছাড়া সেটা কৃষ্ণ-পক্ষের শেষ দিক, কাজেই অন্ধকারে বসেও কোন ফল হবে না জেনে সেদিন ফিরে এলাম।

পরদিন সংবাদ এল শিকারের। কাছের অন্য আরেকটি জঙ্গলে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সামনে রথের চূড়ার মত একটি পাহাড়, তার পিছনে পশ্চিমদিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে পর্বতশ্রেণী। পিছনে পাহাড়ের কোল বেয়ে সামনের চূড়াকৃতি উঁচু পাহাড়টিকে পরিক্রমা করে আমাদের সামনে দিয়ে বয়ে গেছে

একটি সরু নদী, তার এপারে কতকগুলি শাল ও মহুয়ার গাছ। উঁচু পাহাড়ের ঠিক উল্টা দিকে নদীর এপারে একটি মাচা। উত্তর-মুখো হয়ে পাহাড় সামনে রেখে তাতে বসল বিনয় ও নগেন। তাদের কাছ থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের পশ্চিমদিকের ঢালু যেখানে শেষ হয়েছে তার উল্টা দিকে একটি মহুয়া গাছে আশ্রয় নিলাম আমি, এক মাচায় তিনজন বসলে কারুরই শিকারে সুবিধা হবে না বলে। গ্রীষ্মের তপ্ত তৃষ্ণার্ত হাওয়া নদীর সব জল নিয়েছে শুষে, কেবল বাঁকের কাছাকাছি মাচা থেকে কুড়ি গজ ও আমার কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরে নদীর শুকনো বালির মধ্যে খানিকটা জায়গায় জমে আছে জল, অন্তঃসলিলা কোন উৎস থেকে চুঁইয়ে এসে, তাই একে বলে চুঁয়া।

বেলা পড়ে আসছে। দিনশেষের আলোয় এসেছে উদাস গৈরিকের ছোঁয়া। চেয়ে দেখি নদীর ওপারে পাহাড়ের ঢালু পথে নেমে আসছে এক ভল্লুকী ধীর মন্থরগতিতে, তার সঙ্গে ছুটি বাচ্চা শিশু-সুলভ চাঞ্চল্যে ভরা। কখনও বা একটি দৌড়ে কিছুদূরে এগিয়ে যায় আবার ফিরে যায় মার কাছে। মুখে নাক লাগিয়ে আদর করে। দ্বিতীয় বাচ্চাটি দৌড়ে আসে, প্রথমটিকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করে, ভাবটা "মা কি একা তোমার নাকি, আমারও মা।" আবার তুজনে দৌড়ে এগিয়ে যায়, মার সঙ্গে খেলে লুকোচুরি। মাও মাতৃস্নেহে এদের তুষ্টুমা, চাঞ্চল্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলে। মন বলতে থাকে, "আহা, এদের যেন গুলি না করা হয়, এদের অনাবিল সুখের মাঝে যেন মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ না ঘটায়।" ভাই এবং নগেনকে বার বার বলে দিয়েছিলাম তৃষ্ণার্ত জীবকে জল না খেতে দিয়ে গুলি করবে না। মা তার শিশুদের নিয়ে নেমে এল জলের ধারে। খাওয়া শেষ করে সবে ফেরবার দিকে চলতে শুরু করছে, এমন সময় একই সঙ্গে তুই বন্দুকের গুলির শব্দ। ত্রস্ত মা-ভল্লুক আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে করতে শিশুরাও ছুটে এল

মার কাছে, যে মা তাদের একমাত্র আশ্রয়, সব বিপদ আপদ ভয়ের সূচনায় যার ক্রোড়ে পায় তারা অভয় ও আশ্বাস। সাধারণত জন্তু-জানোয়ার আহত না হলে শব্দ করে না, ভাবলাম আহত হয়ে চলে যাবে, তিলে তিলে মরবে তার চেয়ে শেষ হয়ে যাক। কি জানি কি যে ভাবলাম, কি যে হয়ে গেল, বন্দুক তুলে নিয়ে গুলি করলাম। লুটিয়ে পড়ল ভল্লুকের দেহ, 'মা' 'মা' করে আর্তনাদ করে উঠল বাচ্চারা। আরেকটা গুলি। পড়ে গেল একটি বাচ্চা তার মার কাছেই, যেন মার আশ্রয়ে চির বিশ্রাম নিল। দ্বিতীয় বাচ্চাটি উঁচু পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল, 'মা' 'মা' আর্ত ক্রন্দনে মুখরিত করে সারা বনের স্তব্ধতা। পাহাড়ের মাথায় বন থেকে বনান্তরে ধ্বনিত হতে লাগল সেই মাতৃহারা অবলম্বনহীন ভল্লুকশিশুর করুণ ক্রন্দন

শুধু 'মা' 'মা' 'মা'। যেন এক নিরন্তর খোঁজা, অশেষ জিজ্ঞাসা 'কোথায়'? যার কোন উত্তর নেই। বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে এল, একি করলাম!. তার সে কান্না আর সহ্য করতে না পেরে তাকে চুপ করাবার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়লাম। একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার শুরু হল সেই কান্না, শব্দ সূচিত করল সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চলেছে যেখানে গুহায় হয়তো তার বাড়ি। আবার গুলি করলাম শব্দ লক্ষ্য করে। ভয় পেয়ে তার কান্নার বাইরের প্রকাশ থেমে গেল, চারিদিক নিস্তব্ধ।

আকাশে আলোর আভাষ তখন মিলিয়ে গিয়ে আঁধারে ছেয়ে গেছে চারিদিক। গাছ থেকে নেমে সরু একটি ডাল ভেঙে তাতে শুকনো পাতা কতকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আগার দিকে আগুন ধরিয়ে মশালের মত ধরে গেলাম যেখানে শুয়ে মা ও তার সন্তান। দেখলাম দুজনের গায়েই একটি একটি গুলির দাগ, আগের গুলি তাদের লাগেনি, আমারই গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে তারা। সঙ্গে বাচ্চা ছিল বলে মায়ের সেই ভয়ার্ত চিৎকার, গুলি লেগেছে বলে নয়।

ভুলে গেলাম যে, শিকার করতে, হত্যা করতেই তো গিয়েছিলাম, ভুলে গেলাম তারা হিংস্র পশু। মন জুড়ে রইল তীব্র বেদনা ও বিশ্বমাতারই রূপের বিকাশ, সে মা এবং যে রইল সে মাতৃহারা শিশু।

একুশ

সাথী

শুনেছি ক্রৌঞ্চ যুগলের মাঝখানে ব্যাধের নির্মম শর যখন টেনে দিল বিচ্ছেদের রেখা তখন শোকার্ত ক্রৌঞ্চের করুণ দৃশ্য স্পর্শ করে আদি কবির অন্তর, তাঁর স্পন্দিত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয় পৃথিবীর আদি কাব্য নির্ঝরের ধারা।

১৯১৬ সালে আমি যখন জপ্লাতে অ্যাটেস্টেশানের কাজ করি তখন একদিন কুমীর শিকারে যাই। বিশাল আয়তন শোন নদের বক্ষে কোথাও কোথাও জেগে উঠেছে পীতাভ বালির চর, তাতে চখাচখির

মেলা দূর থেকে দেখা যায়। এই পাখীরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। শোনা যায়, একবার জোড় ভাঙলে তার সাথী চিরদিন থাকে নিঃসঙ্গ, পুরাতনের আসন শূন্য থাকে, তবু নবাগতের স্থান হয় না সেখানে। ওখানকার লোকেদের বিশ্বাস, সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে এলে তুই সাথী নদীর তুই পারে আশ্রয় নেয়, রাত্রিশেষে ঊষার আলোয় আবার হয় তাদের মিলন। এ ওখানকার অধিবাসীদের স্থির বিশ্বাস, এর অন্যথা বললেও তারা উড়িয়ে দেয়। যাই হোক, সেদিন বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে একটিকে মারতেই সেটি পড়ে গেল, বন্দুকের শব্দে অন্যান্য পাখী যারা বসেছিল উড়ে গেল। একটি পাখী কিছুদূর উড়ে গিয়ে যখন দেখল তার সাথী তার সঙ্গে গেল না, তখন ফিরে এল। কিছুদূর তাকে ডেকে ডেকে তার রক্তাক্ত দেহের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াল, শেষটায় ফিরে এসে বসল তার মৃত সঙ্গীনীর কাছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যেন বিশ্বকবির মধুশ্রীর মত বলতে চায় "বিচ্ছেদ ঘটিও না, একই লোকে হউক আমাদের গতি।" সেই থেকে বহুদিন আর পাখী শিকার করিনি। ক্রমে মনে এই প্রশ্ন জেগেছে পশু-পাখীদের মধ্যেও কি আছে সম্প্রীতি, একে অন্যের প্রতি মমত্ববোধ? সন্তানের প্রতি কি পশু কি পাখী সকল মায়েরই দেখছি অসীম স্নেহ, যতদিন সে শিশু থাকে, কিন্তু সঙ্গীর প্রতি? এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম একদিন। সে চিত্র জ্বলন্ত রেখায় আঁকা রয়ে গেছে মানসপটে।

১৯২০ সালে জানুয়ারির আরম্ভ। সবে গভর্নরের শিকার শেষ হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিল্‌বী এসে বললেন যে, বাঙ্গলাদেশ থেকে তাঁদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু সস্ত্রীক শিকারে আসতে চান, তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে। মিসেস কিল্‌বীর একান্ত ইচ্ছা এমন জায়গায় তাঁদের ক্যাম্প করতে হবে যেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। সারা পালামৌ জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য মানসপটে একে একে ফুটে উঠলো। তারমধ্যে শিকার এবং ক্যাম্প করার উপযোগী তুটি জায়গার কথা বিশেষ করে মনে হয়।

এক সারুওতপাট, দ্বিতীয় সেরেন্দাগ। চারহাজার ফুট পাহাড়ের শিখরে সারুওতপাট। অতি অপূর্ব স্থান সন্দেহ নেই, কিন্তু বড়ই দুর্গম। গাড়ি সেখানে যায় না, হেঁটে এই খাড়াই উঠতে হয়, তাই সে জায়গাটি নির্বাচন-সূচী থেকে বাদ দিলাম। সেরেন্দাগ কেমন হবে দেখবার জন্য মিসেস্ কিল্‌বীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডাল্টনগঞ্জ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে লাত পার হয়ে কিছু দূর গিয়ে গভীর বনের ভিতর পথরেখা গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। পথ হারিয়ে ফেললাম। কোন্‌দিক দিয়ে যাব ভাবছি, এমন সময় শুনতে পেলাম মোষের গলার কাঠের ঘণ্টার শব্দ। মোষ যখন চরছে সঙ্গে চরওয়াহা আছেই—অনুমান করে চিৎকার করে ডাকলাম। প্রত্যুত্তর দিয়ে কিছু পরে কাছে এসে দাঁড়াল রাখাল ছেলে, যাকে ওরা বলে চরওয়াহা। সেরেন্দাগের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, খুব কাছেই আমাদের গন্তব্য স্থান, জঙ্গলটা পেরোলেই গ্রাম, তার উপকণ্ঠে। বললাম "তুই আমাদের মটরে চল আমাদের পথ দেখিয়ে দিবি", তাতে তার মহা আপত্তি। "না হুজুর, বাঘে আমার মোষ মেরে দেবে, আমি এখান থেকে সরলেই।" সে কি রে, এখন সকাল ন'টা, গ্রামের এত কাছে, এক্ষুনি ফিরে আসবি, এর মধ্যে বাঘে মোষ মারবে—এও কি একটা কথা হল? চল চল।" কি আর করে, শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে [illegible] চলল। সেখান থেকে মাত্র দুশ' গজ দূরে জঙ্গল শেষ হয়েছে, একটু আগেই সেরেন্দাগ গ্রাম। আমাদের গম্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে সে তখনই ফিরে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে রাজপথ। ববেসাঁড়ের দিকে রাস্তার পশ্চিম ধাবে ওপারেই একটি খুব নিচু পাহাড়, যেন কোন মহাকায় দৈত্যের পাশবালিশের মত দেখতে। গাড়ি রেখে আমরা তার উপরে উঠে গেলাম। চেয়ে দেখি সামনে অপরূপ শোভা। বহুদূরব্যাপী ঢালু বেয়ে নেমে গেছে অরণ্যের ঢেউ, দূরে উত্তরবাহিনী কোয়েলের রুপালী রেখা, তার ওপারে শান্ত সমাহিত পাহাড়, অঙ্গে তার বনের আবরণ, সকালের আলোয় প্রদীপ্ত। তার চারহাজার ফুট উঁচু চূড়া

সুরগুজারাজ সীমানায় ঢালু পালামৌর অধিকারে। মিসেস্ কিল্‌বা মহাখুশি। সেই নিচু পাহাড়টির উপরেই হবে ক্যাম্প। কোথায় কোন্ তাঁবু হবে সব কথা হয়ে গেল। সেরেন্দাগ থেকে ফেরবার পথে দেখি সেই রাখাল ছেলেটি বসে কাঁদছে, যেটুকু সময় সে অনুপস্থিত ছিল তার মধ্যেই বাঘ এসে তার ছুটো মোষ মেরে দিয়ে গেছে। আমরা তাকে সেই মোষ ছুটির মুল্যস্বরূপ টাকা দিলাম কিন্তু তাতে তার ছুঃখ কিছু মাত্র প্রশমিত হল না। সে বার বার বলতে লাগল "টাকা দিয়ে আমি কি করব, ওদের যে ছেলেবেলা থেকে হাতে করে বড় করেছি, ঘরের লছমী ছিল ওরা।"

২২শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় মিঃ কিল্‌বীর সম্মানিত অতিথিরা এলেন, লেডী ও স্যার হেনরী হুইলার, বাংলার তদানীন্তন চীফ্ সেক্রেটারী। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলেন স্যার হেনরী। শিকারের বন্দোবস্ত হিসাবে কদিন থেকে আমরা বাঘের সম্ভাবিত গতিপথে মোষ বাঁধবার ব্যবস্থা করেছি। ২৩শে সকালে সংবাদ এল কাছেই কোয়েলের ঠিক পশ্চিম পারেই জঙ্গলে বাঘে মোষ মেরেছে। মাচা ইত্যাদি আগেই প্রস্তুত ছিল। সকালেই সেই বনে চলে গেলাম আমরা শিকারের জন্য প্রস্তুত হয়ে।

মাচাগুলির সামনে দিয়ে ডানদিক থেকে বাঁয়ে ঘুরে গেছে একটি ছোট নালা। একেবারে ডানদিকের মাচায় আমি, আমার পাশের মাচায় মিসেস্ কিল্‌বী একা, তার পাশেরটিতে লেডী ও স্যার হেনরী হুইলার এবং সবচেয়ে বাঁয়ে মিঃ কিল্‌বী। আমার ও মিঃ কিল্‌বীর ছু'পাশ থেকে ক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে গাছের উপর স্টপরা। আমাদের উল্টোদিকে কোয়েলের পার থেকে হাঁকোয়ারা অর্ধচন্দ্রাকারে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো হাঁকোয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। খুব ঘন শালের বন দৃষ্টিপথ রোধ করে। যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা সেখানে উলুঘাস ও বন্য খেজুরে ছেয়ে আছে। বন্য খেজুরের গাছ লম্বা হয় না, বড় বড় ঝোপের মত হয়। হাঁকোয়া আরম্ভে হাঁকোয়ারা খুব জোর একবার

করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কিছু পরে হঠাৎ পাশের মাচা থেকে মিসেস্ কিল্‌বী তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে মিঃ কিল্‌বীর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন "এখানে এসো, আমি তোমায় দেখিয়ে দিতে পারি কোথায় বাঘ আছে" (Come here, I can show you where the tiger is.) এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খাঁউ করে এক গর্জন করে বাঘ স্যার হেনরী ও মিসেস কিল্‌বীর মাচার মাঝখান দিয়ে পিছনে পালিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। অদূরে একটা খস্ খস্ শব্দ লক্ষ্য করে সজাগ হয়ে রইলাম, খেজুর ঝোপের তলা থেকে বেরিয়ে এল বিরাট এক ভল্লুক। যদিও বাঘের শিকার, অন্য জানোয়ার মারা নিয়ম নয়, তবুও বাঘ তো পালিয়ে গেছে এই মনে করে বন্দুক তুলে মেরে দিলাম তাকে, সঙ্গে সঙ্গে বিকট

আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠল সারা বনের স্তব্ধতা। কিন্তু এ-তো শুধু যে আহত তার আর্তনাদ নয়, কি ব্যাপার ? চেয়ে দেখি বিকট আর্তনাদ করতে করতে পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল আরেকটি ভল্লুক আয়তনে আহতটির চেয়েও বড়—তারই সাথী। কাছে এসে দেখল ওর গা দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে, কিছুক্ষণ ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, তারপর যখন দেখল ওর চলার ক্ষমতা নেই তখন সাম্‌নের দু' পা দিয়ে তার বিশাল দেহ কোলে তুলে নিল। আসন্ন বিপদ, মৃত্যু কোন কিছুই তাকে টলাল না, একা স্বচ্ছন্দে পালাতে পারত, তাও সে গেল না। সাথীকে বুকে তুলে নিয়ে বিপদ উপেক্ষা করে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। হাঁকোয়াদের সামনে পড়তেই তারা ওদের প্রাণপণে আটকাবার চেষ্টা করল কিন্তু দুজনের গর্জন শুনে ও তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্ভীক গতি দেখে প্রাণভয়ে সরে দাঁড়াল। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু। স্বকৃত অপরাধের কথা ভেবে এত দুঃখ হল, মনেপ্রাণে কামনা করতে লাগলাম বিপদের মুখ থেকে তার সঙ্গীকে যেমন করে উদ্ধার করে নিয়ে গেল, মৃত্যুর গ্রাস থেকেও যেন তাকে সযত্নে ঢেকে রাখতে পারে। চাই না আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি, গুলি যেন তাদের বিচ্ছেদ না ঘটায়।

* * *

কিন্তু সেদিন অন্য একটি দুর্ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষমান ছিল। হাঁকোয়া চলছে। হঠাৎ একদিকে হাঁকোয়াদের মধ্যে খুব গোলমাল শুরু হল। একটুক্ষণ থামে আবার শুরু হয়, আবার থামে আবার শুরু—এমনি করে চলল। কি ব্যাপার ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তারপরই কানে এল বাঘের গর্জন সেইদিক থেকে। দেখি, হাঁকোয়ারা চুপচাপ ডানদিক দিয়ে ফিরে চলেছে। ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হল রে ? হাঁকোয়া শেষ কর"। তাতেও তারা চলে যাচ্ছে দেখে যাঁরা মাচায় আছেন তাঁদের বসে থাকতে বলে আমি নেমে গেলাম

দেখতে কি ব্যাপার। যেদিকে গোলমাল হচ্ছিল সেদিকে গিয়ে হাঁকোয়া যাদের দেখলাম তাদের জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলল, বাঘ একজনকে মেরে ফেলেছে। প্রথম যে মিসেস্ কিল্‌বীর মাচার পাশ দিয়ে পালায় তারই জোড়া এটা। এগিয়ে গিয়ে দেখি মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটি, বাঁ হাতটা মেলা রয়েছে। বাঘের মস্ত থাবার এক আঘাতে মাথার চামড়া ছিঁড়ে খুলির হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বাঁ বাহুর উপর আরেক থাবার চিহ্ন, সেখানেও গভীর ক্ষত, হাড় দেখা যাচ্ছে। পরনে খাটো ধুতি ও জামা। দূর দূর গ্রাম থেকে এরা হাঁকোয়া করতে আসে। অনেক সময় রাত্রে আর গ্রামে ফিরে যেতে পারে না, তাই সামান্য কম্বল যার যা থাকে পালামৌর দুর্দান্ত শীতের রাত্রে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিয়ে আসে। সেটা সঙ্গেই থাকে কাঁধের উপর বা পিঠে বাঁধা। এরও একটি কম্বল পুরু করে ভাঁজ করা কাঁধের উপর ছিল, সেটা পাশে পড়ে রয়েছে। হাঁকোয়ারা এগোতে এগোতে সামনে দেখে বাঘ। সকলে মিলে হল্লা করাতে সে একটু এগোয় এবং কিছু দূর গিয়ে বসে। আবার আর সকলে জড়ো হয়ে দ্বিগুণ চিৎকার করে, আবার এগোয় সে, এইভাবে চার-পাঁচবার এগিয়ে সে মরিয়া হয়ে ফিরে দাঁড়ায়। মিসেস্ কিল্‌বীর শিকারের রীতিবিরুদ্ধ চিৎকারে বোঝে সামনে লোক আছে, তাতে তার সন্দেহ জাগরুক হয়। প্রথম বাঘের গর্জনে বুঝেছিল যেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেদিকে বিপদ আছে। মিসেস্ কিল্‌বীর চিৎকারের অন্য ফল হল এই ভল্লুক তার নিজের পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে বনের অন্তরাল দিয়ে লুকিয়ে যেতে গিয়ে আমার সামনে পড়ল। তারপর গুলির শব্দ ও ভল্লুকের আর্তনাদে সন্দেহ আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হল। তাই তখুনি সে মরিয়া হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। ভল্লুককে গুলি করা শিকারের রীতিবিরুদ্ধ না হলেও আমার ঠিক উচিত হয়নি, কিন্তু আরেকটা বাঘ যে থাকতে পারে এটা অনুমান করিনি।

কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম লোকটি মরেনি। বাঘ তার

কাঁধের কম্বল কামড়ে ধরে লোকটিকে ধরেছে মনে করে মনের সাথে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে পালিয়ে যায়। কম্বলটি দেখলাম। যেখানে কামড়েছে সেখানে চাপ বেঁধে গেছে। যেন হাইড্রলিক প্রেসারে চাপা।

মাচায় যাঁরা আছেন তাঁদের ডেকে বলে দিলাম শিকার হবে না, বাঘ মানুষ জখম করেছে। ডালটনগঞ্জ থেকে যাবার সময় তদানীন্তন সিভিল সার্জন রায় বাহাদুর শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সহ একটি বাক্স এনেছিলাম। সঙ্গে সেটি ছিল। তা থেকে টিংচার আওডিন দিয়ে, ক্ষত পরিষ্কার করে কার্ব... দিয়ে পুড়িয়ে তখনই জঙ্গল থেকে পাৎলা গাছ কাটিয়ে তার সাহায্যে মই-এর মত স্ট্রেচার বানান হল এবং তাতে শুইয়ে লোকটিকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। আমার নিজের গাড়ী ছিল না। মিঃ কিলবী-র মোটর চাইতে তিনি বললেন, "একটু পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—all that he requires is washing with clean water." যাই হোক, তা যে নয় তা তাঁকে বলে লোকটিকে ষোলজন বাহক দিয়ে সেই অবস্থায় পত্রপাঠ ডালটনগঞ্জ হাসপাতাল অভিমুখে রওনা করে দিলাম। ব্যবস্থা করলাম যাতে কিছু দূর অন্তর অন্তর বাহক পরিবর্তন হয়। ওখানে এ্যাসিস্টেন্ট সার্জন ছিলেন শ্রীবিমল রায়। তাঁর কাছে চিঠি দিলাম যাতে চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় এবং যে-কোন মতে হোক ওর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। ভাগ্যক্রমে লোকটি সব চেষ্টা সার্থক করে মাসখানেক পরে সেরে উঠল।

শিকারের অন্য খবর থাকা সত্ত্বেও সেদিন আর শিকার হল না। এই ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় হাঁকোয়াদের ভেতর একটা বিষাদের ছায়া পড়েছিল। তারা আর সে উদ্যম নিয়ে হাঁকোয়া করতে পারবে না জেনে আমিও সে চেষ্টা থেকে বিরত হলাম। সেদিন অতিথিরা স্থান পরিদর্শন করে কাটালেন।